★ দুঃখ কী জানেন? ভগবান কী তাই এযাবৎ কেউ জানত না। যদি জানত তাহলে মন্দির তৈরী হত না, মসজিদ তৈরী হত না, গীর্জা তৈরী হত না। ঋষিরাই কেবল ধরেছিল, তারাই বুঝেছিল যে, মানুষ ভগবান হয়। তাই 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' বলেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, তারা বললে, 'ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।'

—শ্রীজীবনকৃষ্ণ

★ মাটির প্রতিমায় পূজা হতে পারে, আর জীয়ন্ত মানুষে হতে পারে না?

—শ্রীরামকৃষ্ণ

★ হাতি এত বড় জন্তু কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষের মধ্যে খুঁজবে। মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

★ *Man becomes God. I have this tale to tell the world. Man is born to be God, that is the sole and fundamental aim of humanlife.*

—Shri Jibankrishna

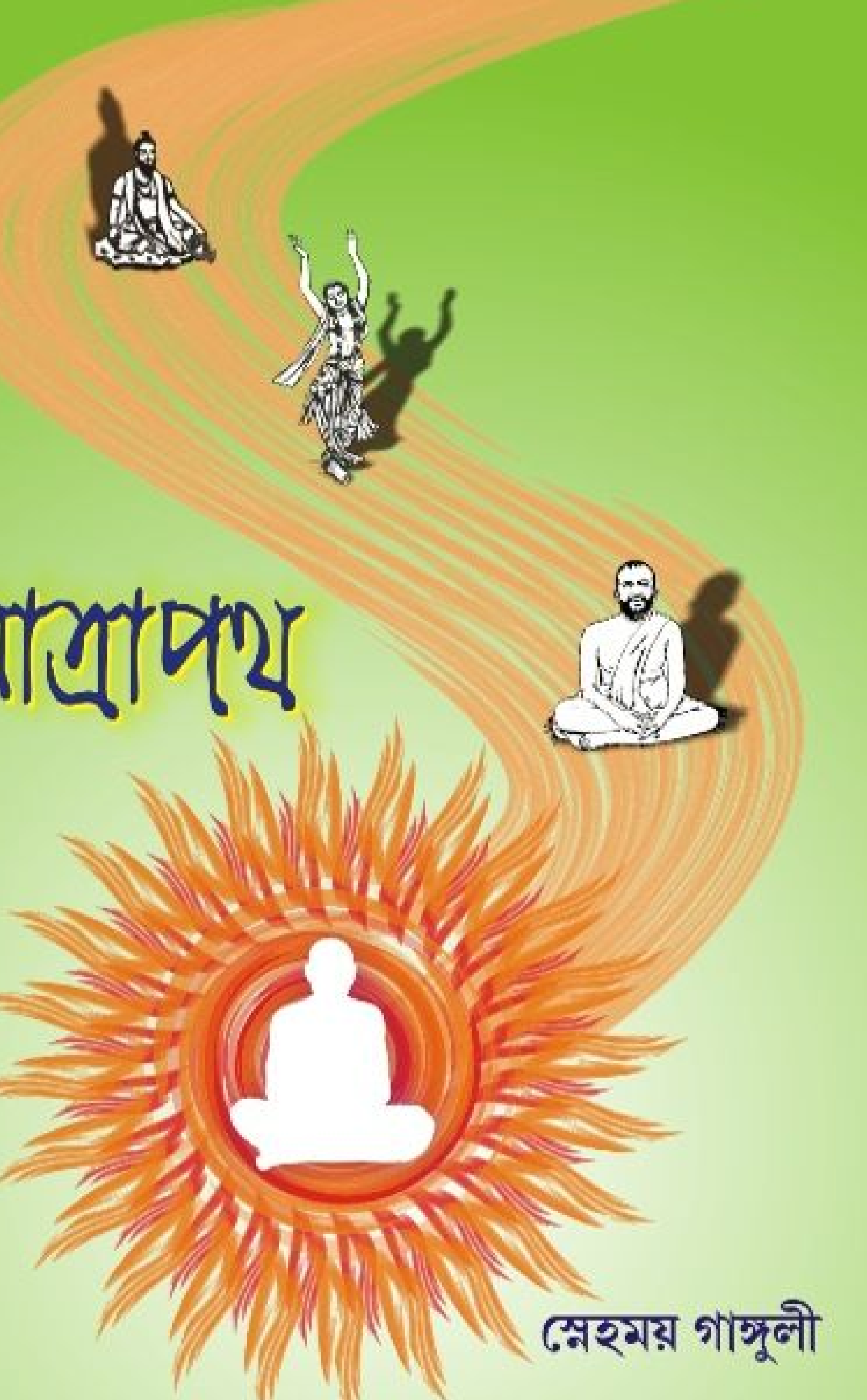
াত্রাপথ
স্নেহময় গাঙ্গুলী

যাত্রাপথ

নিবেদক

ডঃ স্নেহময় গঙ্গোপাধ্যায়

মেঘা পাবলিশার্স

১৭/১/৩৭, বিধান নগর রোড

কলকাতা ৭০০ ০৬৭

YATRAPATH
By Dr. Snehamoy Gangopadhyay

প্রকাশক :
শঙ্কর প্রসাদ দাস
১৭/১/৩৭, বিধান নগর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬৭
E-Mail:spdas1957@rediffmail.com
☎ : (033) 2356 2831
M : 98312 00928

প্রথম প্রকাশ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭

গ্রন্থস্বত্ব :
শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম

I S B N : 978-81-906907-4-4

বর্ণসংস্থাপনা :
শঙ্কর প্রসাদ দাস

প্রচ্ছদ চিত্রায়ণ :
প্রণব সূত্রধর, দুর্গাপুর

মুদ্রণ :
গ্যালাক্সি প্রিন্টার্স
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

মূল্য : ২৫ টাকা।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা - ১২

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা - ৬

৩। পবিত্র দত্ত
ভূবনমোহন রায় রোড
বড়িষা, কলকাতা - ৮
দূরভাষ- ০৩৩-২৪৪৭ ৩৪৬৩

৪। শ্রীধর ঘোষ
বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ-০৩৪৬৩-২৫৫৩৭৬

৫। শঙ্কর প্রসাদ দাস
১৭/১/৩৭, বিধান নগর রোড
কলকাতা-৬৭

সূচিপত্র

ভূমিকা

১। যাত্রাপথ ... ... ১ - ২৮

২। বিচিত্র সাধ ... ... ২৯ - ৩৩

৩। সাধনক্রম ... ... ৩৪ - ৪৬

৪। দুর্গারূপকল্পের দেহতত্ত্ব ... ... ৪৭ - ৫৩

৫। কালী তত্ত্ব ... ... ৫৪ - ৫৯

৬। স্বরবর্ণের যোগাঙ্গ ... ... ৬০ - ৬১

৭। দোল ও হোলির পার্থক্য ... ... ৬২ - ৬৪

৮। রথযাত্রার আদি-অন্ত ... ... ৬৫ - ৭২

৯। ওঙ্কার রহস্য ... ... ৭৩ - ৭৭

১০। কৃষ্ণজন্মরহস্য ... ... ৭৮ - ৮১

১১। মধুবিদ্যা ... ... ৮২ - ৮৭

১২। শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গ ... ... ৮৮ - ১০০

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ধর্ম অনুভূতিমূলক। আত্মিক অনুভূতিকে ভিত্তি করে এখানে ধর্ম ভাবনার বিবর্তন ঘটেছে। এর পরিণতির পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বর্হিভারতেরও বিভিন্ন দেশ ও জাতি। বিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস বড় জটিল। তবুও মূল স্রোত ধরে এগিয়ে গিয়ে গতিপথটি চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে বোঝা যায়। যেন পূর্বনির্ধারিত (Pre-destined)। নিরপেক্ষ মন নিয়ে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা হয়েছে এখানে। যোগের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস ভাবনার ক্ষুদ্র প্রয়াস এটি। এই চোখ দিয়ে অন্য আরও কিছু বিষয়ের দিকে তাকালে বিস্মিত হ'তে হয়। যাত্রাপথের পরের টুকরো প্রবন্ধগুলিতে তা তুলে ধরা হ'ল। এ শুধু মনের খেয়াল নাকি সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত কোন রত্নের আবিষ্কার তা জানাবেন পাঠকেরাই। 'সাধনক্রম' প্রবন্ধটিতে যোগদৃষ্টির মূল ভিত্তিটি ব্যক্ত করা হয়েছে। দুর্গা ও কালীতত্ত্বে নতুন আলোকপাতের চেষ্টা হয়েছে। 'ওঙ্কার রহস্যে' রামায়ণের সাথে ওঙ্কার এর যোগ স্থাপনে নতুন রস আস্বাদনের সুযোগ পাবেন উদার মনস্ক পাঠক। শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে বক্তব্য হয়ত একটু কঠোর মনে হবে আবার স্বরবর্ণের যোগাঙ্গ নিছক ভাল লেগে যেতে পারে।

বোলপুর পাঠচক্রে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অনুশীলন কেন্দ্রে) বিভিন্ন সময়ে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার নির্যাস সংকলিত হ'ল এখানে। বস্তুত এগুলি পাঠচক্ররূপ গবেষণাগারের সম্পদ।

আশা করি, সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী পাঠকদের বইটি ভাল লাগবে।

চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ - ৯৪৭৫০০৭১৬৮

ডঃ স্নেহময় গঙ্গোপাধ্যায়
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭

যাত্রাপথ

।। ১ ।।

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কাউকে দাস কাউকে প্রভু। দাসপ্রথা ঈশ্বরেরই বিধান— এই ধর্মীয় কুযুক্তি মানতে মন চাইল না— চার্লস ডারউইনের। যাজক বৃত্তি ছেড়ে সত্যান্বেষী মন নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন ভূ-পর্যটনে। এক কোষী জীব থেকে ক্রম বিবর্তনে উন্নততর জীব মানুষের উদ্ভবের তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। এতে আলোড়িত হ'ল সারা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীমহল। দাস প্রথার অবসানে তার এই মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনার ভূমিকা অপরিসীম।

কিন্তু অন্ধকুসংস্কার ও গুরুবাদের কঠোর অনুশাসনে আজও ধর্মপ্রাণ কোটিকোটি মানুষকে মগজ ধোলাই করে দাস করে রাখা হয়েছে। অন্ধবিশ্বাস ছেড়ে তারা দর্শন অনুভূতি ও যুক্তির সাহায্যে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার সাহস পায় না। তাই আত্মিক মুক্তির সোনালী আলোক রেখা অনুসন্ধানে ধর্মীয় চেতনার ক্রমবিবর্তন ও তার অভিমুখটি জানা অত্যন্ত জরুরী। ধর্মকে আফিং বলে উড়িয়ে দিয়ে বা শুধুমাত্র বাইরে থেকে সমাজ পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণে ধর্মের প্রকৃত গুরুত্ব ও তার ইতিহাস জানা যায় না। আত্মিক চেতনার বিকাশের প্রকৃতিটি বুঝে তার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাসটি জানলেই মানুষ আত্মিক মুক্তির দিশা পাবে, মুখোমুখি হবে নিঃশব্দ এক মহাবিপ্লবের।

বিজ্ঞানীদের অনুমান আজ থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে বর্তমান মনুষ্যপ্রজাতির (হোমো সেপিয়েন্সের) হয়েছিল আবির্ভাব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ কখনও বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন অসহায় গুহাবাসী মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিভূ নানা অলৌকিক শক্তিধর দেবদেবীর কল্পনা করেছে— তাদের প্রসন্নতা আকাঙ্খায় পুজো দিয়েছে, নিজেদের আহার্য বস্তু উৎসর্গ করেছে।

হাজার হাজার বছর এইভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। সভ্যতার চাকা ধীর লয়ে গড়াতে গড়াতে কৃষি সভ্যতার বিকাশ হ'ল। মানুষ পেল নিশ্চিন্ত কিছু অবসর। তখন কিছু মানুষ তাদের দেহের ভিতর অনুভব করল এক আশ্চর্য

উদ্দীপনা। জাগল আত্মিক অনুভূতি। বুঝল ধর্মের সকল রহস্য আপন হৃদয় গুহায় নিহিত। সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার ঘটনা। ভারতবর্ষে, সম্ভবত তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান এই বঙ্গদেশেই* কিছু মানুষের দেহে প্রাণশক্তির অন্তর্মুখী বিকাশে প্রধানত দেবস্বপ্নের মাধ্যমে চৈতন্যোদয় হতে থাকল যে ভয়কে জয় করার শক্তি তার আপন অন্তরে বিধৃত।

বিষয়টি অনুধাবনে সুবিধা হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিক একটি স্বপ্নের উল্লেখে। উনি দেখেছিলেন, কয়েকজন মানুষ মন্দিরের সামনে কেঁদে তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করছেন ও তাদের উদ্ধারের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, তোমরা ওখানে বৃথা কেঁদো না, তোমাদের দুঃখজয়ের শক্তি আছে তোমাদের ভিতরে। .....

ধীরে ধীরে দেহের ব্যাধি ও মৃত্যুভয় তথা আধিভৌতিকতা অতিক্রম করে উন্মেষ হল আধ্যাত্মিকতার— আত্মজিজ্ঞাসার। অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। ধর্ম তথা জীবনসত্যের অন্বেষণে মানুষের যাত্রা হল শুরু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় এই সময় থেকেই মানুষ তাদের জ্ঞানের উন্মেষের বিবরণ স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য, সভ্যতার অগ্রগতির অপরিহার্য সহায়ক অঙ্গ হিসাবে লিপি আবিষ্কার করতে শিখল। প্রাচীন মিশরীয়দের ধারণা ছিল মৃত্যুর পরও থেকে যায় মানুষের আত্মা। তারই আনন্দের আয়োজনে পিরামিড গাত্রে আঁকা হতে থাকল নানান বিষয়ের ছবি যা থেকে সৃষ্টি হ'ল মিশরীয় চিত্রলিপি হায়ারোগ্লিফিক্স। পরে তা ফিনিশীয়দের দ্বারা বিবর্তিত হয়ে রেখলিপিতে পরিবর্তিত হল। সূচনা হল প্রকৃত সভ্যতার।

মিশর-এশীয় বা ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর সমগোত্রীয় দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী একটি নৃগোষ্ঠী** বসবাস করত উত্তর ভারতে— যারা সিন্ধুসভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তাদের কিছু লোক বাণিজ্যসূত্রে এল জলপথে দক্ষিণভারতে এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর সংলগ্ন এলাকায় তথা বঙ্গদেশে। তাদের অনেকে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। তারা এখানকার কোল, সাঁওতাল

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'বঙ্গ' নামকরণ আদিম অধিবাসী কোল উপজাতি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছিল যার অর্থ ছিল দেবতা (বোঙ্গা)। বঙ্গভূমি মানে দেবতাদের বিচরণ ভূমি।

***দ্রাবিড়ভাষী এই গোষ্ঠীর বংশধর বর্তমান তামিলগণ।*

ইত্যাদি আদিম অধিবাসীদের (অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠী*) সংস্পর্শে তন্ত্র সদৃশ ধর্মের সূচনা করল। প্রকৃতির দেবী জাহেরএরা ও খুনটও উৎসবে পূজিত মারাংবুরু, যার কৃপায় পশুরা বশে আসে ও কৃষিকাজ সম্ভব হয়, গৃহীত হ'ল যথাক্রমে কুমারী মাতা ও পশুপতিনাথ রূপে। এদের পূজা ছড়িয়ে গেল সারা ভারতে, দক্ষিণে কন্যাকুমারী ও উত্তরে সিন্ধু পর্যন্ত। এরপর এশিয়া মাইনর (তুর্কী) থেকে এল একদল আর্য— হ্রস্বকপাল যুক্ত আল্পীয় নরগোষ্ঠীর আর্য। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে কিছু এবং বিদেহ থেকে বাংলা পর্যন্ত জনসমাজে এদের দেহবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের মিশ্রণে বাঙালীর দেহ গঠনের যে বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল তা নতুন মাত্রা পেল আল্পীয় আর্যদের সংমিশ্রণে। যাইহোক, তাদের প্রভাবে পূর্বের ধর্ম বিশিষ্টতা লাভ করল। পশুপতি হলেন মানুষের পশুত্ব দমনকারী দেবতা শিব। তিনি মহাযোগী। যোগসাধনা ও শিবের উপাসনা দ্রাবিড়রাও গ্রহণ করল। আর কুমারী মাতা দীর্ঘকাল পর স্বীকৃত হলেন তারই স্ত্রী রূপে। দুর্গাপূজায় কুমারী পূজা প্রথা এরই স্মৃতি বহন করে। প্রকৃতির দেবী থেকে যান নবদুর্গা বা নবপত্রিকা হয়ে। মাতৃতান্ত্রিক বাংলায় ক্রমে শিবের চেয়ে শক্তির পূজা প্রাধান্য পেল। অতঃপর তন্ত্রসাধনার সূচনা হ'ল বাংলায়। এদিকে দীর্ঘকপালযুক্ত নর্ডিক গোষ্ঠীর আর্যদের আগমন ঘটল উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তন্ত্রগুরু শিবের আদিরূপ পশুপতিনাথের পূজা তখন প্রচলিত ছিল হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োতে। সেখানকার দ্রাবিড় সভ্যতাকে ধ্বংস করল এই আর্যরা। ভারতের মাটিতে আত্মিক স্ফুরণের অনুকূল জলবায়ুতে তাদের দেহে জাগল উচ্চস্তরের একটি সাধন ধারা— বৈদিক সাধনা। সে প্রায় চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে।

এই বৈদিক যুগ ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার এক অর্থবহ অধ্যায়। আমি কে? জীবনের উদ্দেশ্য কী? ইত্যাদি প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রথমদিকের ভয়, বিস্ময় ও আনন্দ উদ্রেককারী প্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠাতৃ কাল্পনিক দেবতারা অন্য মাত্রা পেল। দেহের ভিতরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চৈতন্যের বিবর্তনে সৃষ্ট দর্শন ও অনুভূতির (পঞ্চকোষ ও সপ্তভূমির অনুভূতির) সাথে তাদের মেলাবার চেষ্টা করা হল। যেমন, বাইরের সূর্যদেবতা হলেন সহস্রারের সূর্যমণ্ডলস্থ

*আদি-অস্ত্রাল নৃ-গোষ্ঠী।

পুরুষ। ঝড়ের দেবতা পবন হলেন মহাবায়ু (কুণ্ডলিনী)। বৃষ্টি ও সমুদ্রের দেবতা বরুণ হলেন প্রাণময় কোষে ব্রহ্মবারি ও সহস্রারে ব্রহ্মসমুদ্র। পরে বিভিন্ন আত্মিক অবস্থা জ্ঞাপক দেবতাদের (বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি) এক ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিসাবে দেখা হ'ল। বহুদেববাদ থেকে ধীরে ধীরে তারা একেশ্বরবাদে উত্তীর্ণ হ'ল।

দীর্ঘকাল ধরে শ্রুতি পরম্পরায় আগত বহু বৈদিক ঋষির অনুভূতির সংকলনই পরে বেদ সৃষ্টি করেছে। প্রথমপর্বে ঋষির প্রার্থনা ছিল— 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'। অনেক দেবতা, কোন্ দেবতাকে দেব ঘৃতাহুতি? পরবর্তীকালে সে প্রশ্নের উত্তর মিলল— 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' অনেক নেই, আছেন এক। নূতন উপলব্ধির আনন্দে তারা ঘোষণা করলেন—

"বেদাহমেতং পুরুষম্ মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ।

ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" অর্থাৎ আঁধারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি দেখেছি— তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে জয় করা যায়, অন্য উপায় নাই। এই বিশাল বিশ্ব সেই পরম একেরই বিচিত্র বিকাশ। সেই সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ আমারও স্বরূপ। সেই পরম পুরুষের সম্যক পরিচয় লাভের তথা নিজেকে জানার জন্য অন্বেষণ চলতে থাকল। আর এই অন্বেষণে প্রধান সহায়ক ছিল দেবস্বপ্ন। তারা বিশ্বাস করতেন এই দেবস্বপ্নের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা দেহস্থ আত্মা (ছান্দোগ্য) এবং জাগ্রত অবস্থার দর্শনের চেয়ে স্বপ্নের অনুভূতি শুদ্ধতর (মাণ্ডুক্য)।

এদিকে সর্পিলগতিতে কুণ্ডলিনী জাগরণ, ষড়চক্র ভেদ, মাতৃরূপে ইষ্টমূর্তি দর্শন ইত্যাদি অনুভূতি সমৃদ্ধ তন্ত্র সাধনা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করল। এখানকার নাথ, যোগী ও সিদ্ধাচার্যরা দাবী করত ধর্মের সমস্ত রহস্য মানবশরীরের মধ্যেই নিহিত। এইসব ধর্মের পরম্পরা তন্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। তান্ত্রিকরা যোগে বিশ্বাসী, ষটচক্র ভেদে আস্থাবান। তন্ত্রবিদ্যার সংকলনকে বলা হয় আগম অর্থাৎ যা বহু আগে থেকেই চলে আসছে গুরু শিষ্য পরম্পরায়। এর অনুশীলন ও পুষ্টিলাভ হতে লাগল দীর্ঘ সময় ধরে। অবশেষে তন্ত্র সাধনা ষড়চক্রের রহস্য ভেদ করে সহস্রারে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটার পর মহাকারণে লয় হবার পথে এগোল। পাশাপাশি পাঁচ রকমভাবে মহাবায়ুর জাগরণ ও সপ্তভূমির সাধন শেষে আত্মা সাক্ষাৎকারের পর বেদও চলল

নিজেকে অতিক্রম করে বেদান্ত সাধনের পথে। আবার বেদান্তের প্রভাবে উত্তর ভারতে তন্ত্রের দর্শন চিন্তা আরও উন্নত হয়ে জন্ম দিল কাশ্মিরী শৈববাদের। যদিও তার সুস্পষ্ট লিখিতরূপ পাওয়া গেছে বহু পরে, নবম শতাব্দীতে।

বৈদিক ঋষি আবিষ্কার করলেন, আমি দেহ নই, আমি আত্মা বা ব্রহ্ম (অহং ব্রহ্মাস্মি) এবং সে কথার প্রমাণ হিসাবে সকলের হৃদয়াকাশে নিজের চিন্ময়রূপ ফুটে ওঠার কথা বললেন বটে* কিন্তু সে প্রমাণ ফুটলো না। ফলে বেদান্তের জ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হ'ল না, নীরসই থেকে গেল। তারা বেদান্তবাদীদের শুঁটকে (শুষ্ক) সাধু বলেই জানল।

যাদের আপনা হতে দর্শন অনুভূতি হয় না, যারা বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হতে পারছে না তাদের জন্য নির্দেশিত হ'ল কর্মকাণ্ড। ধীরে ধীরে এই কর্মকাণ্ড তথা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রাধান্য পেল। প্রায় ১৫০০ বছরের গৌরবময় বৈদিক কৃষ্টির অবক্ষয় শুরু হ'ল। ব্যয় সাপেক্ষ ও সময় সাপেক্ষ যাগযজ্ঞের জটিল বিধি সাধারণ মানুষের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ালে এর প্রতিক্রিয়ায় ও ধর্মের সর্বজনীনতার দাবীতে সৃষ্টি হ'ল বেদবিদ্রোহী ধর্ম— জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম, আজ থেকে ২৫০০ বছর আগে। সাধারণের জন্য সংস্কৃত ভাষা ছেড়ে পালি ভাষায় লেখা হ'ল বৌদ্ধশাস্ত্র। যদিও এর ৫০০ বছর পর হূন আক্রমণে বিব্রত হয়ে চীন থেকে এল কুষাণরা, যাদের আমলে বৌদ্ধধর্মে আমূল পরিবর্তন ঘটে ও তা সর্বসাধারণের ধর্ম হয়ে ওঠে। চীনে লাওৎসে প্রবর্তিত 'তাও' (Tao) ধর্ম ছিল ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের সমতুল্য। 'তাও' প্রবর্তিত চীনা সংস্কৃতির সংস্পর্শে বেদবিদ্রোহী নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রবেশ ঘটল। কুষাণরাজ কণিষ্কের আমলে সৃষ্টি হ'ল মহাযান সম্প্রদায় যারা বৌদ্ধধর্মকে দ্রুত ছড়িয়ে দিল সমগ্র এশিয়ায়। তারা বুদ্ধকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে না দেখে ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় পরমতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করল। সৃষ্টি হ'ল নিজস্ব যোগাচার পদ্ধতি। ব্যক্তিগত নির্বাণ নয়, সাধনার লক্ষ্য হ'ল বিশ্বমৈত্রী ও সমষ্টির মুক্তি।

বুদ্ধদেবের জন্মের সাথে যেমন তাঁর মা মায়াদেবীর শ্বেতহস্তী দর্শনের

*****_সর্বভূতস্থম আত্মানম্ সর্বভূতানি চ আত্মনি / সম্পশ্যন পরমং ব্রহ্ম নান্যেন হেতুনা।_

স্বপ্নটি জড়িয়ে আছে তেমনি ভারতের সীমানা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পিছনেও রয়েছে একটি বিশেষ স্বপ্ন কাহিনী। চীনের রাজা মিং ৬১ খ্রীষ্টাব্দে একদিন রাত্রে স্বপ্নে একটি জ্যোতির্ময় দেবমূর্তি দেখতে পেলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলে একজন বললেন যে রাজা স্বপ্নে বুদ্ধদেবকেই দেখেছেন। রাজা তখন পশ্চিমের দেশে বৌদ্ধধর্মের তথ্যানুসন্ধানে দূত প্রেরণ করেন। ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তার দূতেরা দু'জন শ্রমণকে চীনে নিয়ে যান। তাদের প্রচেষ্টাতে চীনে পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে।

।। ২ ।।

সমগ্র ভারতবর্ষ 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ধ্বনি তুললে— সাধারণ মানুষকে পুনরায় বৈদিকধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা দেবস্বপ্ন ও Vision-কে ভিত্তি করেই বেদ বেদান্তের তত্ত্ব প্রতীকে সরস গল্প করে বোঝাতে লাগলেন। তারা বৈদিক অনুভূতির স্মারক কিছু প্রতীকি আচরণ যোগ করে আবেগ ও ভক্তি মিশ্রিত অনার্য আচারও (পূজা, বিশেষ তিথিতে পুণ্যস্নান, শ্রাদ্ধাদি) মেনে নিলেন। প্রতীকে ধর্মীয় তত্ত্বকথা, নীতি নৈতিকতা ও সামাজিক রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস মিলেমিশে সৃষ্টি হ'ল নানান পুরাণ কাহিনী। যেমন ধরা যাক্ দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগের কাহিনী। শিব অনার্যদের (দ্রাবীড় ও আল্পীয় আর্যদের) দেবতা বলে দক্ষরাজা তাকে তার যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করলেন না অর্থাৎ দেবতা বলে স্বীকৃতি দিলেন না। তাই পুরাণকার নর্ডিক গোষ্ঠীর আর্যদের মধ্যে দক্ষরাজার মতো শীর্ষস্থানীয় কর্মদক্ষ অথচ সংকীর্ণমনা মানুষদের ছাগমুণ্ড বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। আর্য অনার্য সর্বনাশা সংঘর্ষ এড়াতে অনার্য দেবতা শিবকে ঐক্যস্থাপনকারী মঙ্গলময় শিবের (শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্) রূপদান করে কালক্রমে তাকে বৈদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই ইতিহাস লুকিয়ে আছে ঐ পুরাণ কাহিনীটিতে। এর সাথে পুরুষ শাসিত সমাজে পতিব্রতা স্ত্রীর (সতীর) আদর্শও প্রচার করা হয়েছে। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে সতীর দেহাংশ ছড়িয়ে পড়ার (একান্ন পীঠ সৃষ্টির) গল্পে কাশ্মিরী শৈববাদের অদ্বৈততত্ত্ব ও আভাসবাদ বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে এক শিবচৈতন্যই আছে আর তার শক্তির বিক্ষেপে (সূর্য থেকে যেমন আলো ছড়ায়) সৃষ্টি হয়েছে এই জগৎ— শিবচৈতন্যের আভাস স্বরূপ।

এরূপ অসংখ্য বিচিত্র পুরাণ কাহিনী রচনার মাধ্যমে শুরু হল পৌরাণিক যুগ (৩০০-৫০০ খৃষ্টাব্দ)। বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মের চর্চা স্তিমিত হ'ল, জেগে উঠল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও পুরোহিত তন্ত্র। ঘটল পৌত্তলিকতার বিস্তার। বেদে মূর্তিপূজার কথা নেই। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভারতীয়রা মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের আরাধনা করত না। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেও বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়নি। তারও পরে গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাবে বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হ'ল— পরে নানান মূর্তি পূজা বৌদ্ধধর্মে জনপ্রিয়তা লাভ করল। এর প্রভাব পড়ল হিন্দুদের মধ্যে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা দলে দলে হিন্দু হয়ে হিন্দুদের প্রতিমা পূজাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই পর্বে প্রাচীন কিছু কিংবদন্তীকে* ভিত্তি করে কয়েক শতাব্দী ধরে** পর্যায়ক্রমে রচিত হতে লাগল সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষামূলক রূপকধর্মী মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। এগুলি সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। এগুলিতে অনার্যকৃষ্টির সম্রাটপ্রথা ও অবতারবাদের মোড়কে বৈদিক ধর্মের মূল ভাবনাগুলি প্রচারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই আর্যদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি পরশুরাম অনার্য ক্ষত্রিয়রাজ বিদ্বেষী হলেও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে সম্রাট অথচ অবতার রামকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কাহিনীর গভীরে দেখা যায় সাতকাণ্ড রামায়ণে বেদের সপ্তভূমির সাধনের কথা রূপকে বলা হয়েছে। আবার বিষ্ণুর চার অংশে জন্ম নেওয়ার (রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন হওয়ার) কাহিনীতে মাণ্ডুক্য উপনিষদ কথিত ওঁকার রহস্য (ওঁ = অ + উ + ম + O) সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। শক্তিশালী শিবভক্তদের সহযোগিতা ছাড়া বৈদিক সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দশাননকে বধ করে বহুরূপতার মায়া ভেদ করে সর্বভূতে একের উপলব্ধির কথা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই রুদ্রের অবতার হনুমান (শৈবদের প্রতীক) হলেন রামের প্রধান সহায়। এছাড়া প্রাদেশিক ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়ে রচিত বহু গল্প প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তাতে। যেমন রাম দুর্গাপূজা করেছিলেন এ কাহিনী শুধু বাংলা রামায়ণে ঠাঁই পেয়েছে। আর তাই

**প্রথম পর্বে দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের যুদ্ধের কিংবদন্তী অবলম্বন করে রামায়ণ ও পরে আর্যদের নিজেদের ভিতর বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংঘাতের কাহিনী (দশ রাজার যুদ্ধ) অবলম্বনে মহাভারত রচনার পরিকল্পনা গড়ে ওঠে।*

***খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত।*

শক্তিপূজার দেশ এই বাংলায় রামায়ণ সাদরে গৃহীত হয়েছে। আজও বাঙালী রামের পূজার চেয়ে রাম কর্তৃক দুর্গার অকালবোধন স্মরণে বেশি আপ্লুত হয়ে থাকে। লক্ষ্যণীয় বিষয় ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, মানুষের সৎ আচরণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের নির্বিরোধ সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে হিন্দু সমাজে, জেগেছে অসম্ভব সহনশীলতা।

এদিকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আর্য-অনার্য যথেচ্ছ সংমিশ্রণে দেহের গুণগতমান (ঈশ্বরীয় সংস্কারের নিরিখে) কমে গেল। দর্শন অনুভূতি লাভের স্বাভাবিক শক্তিও কমে গেল। ফলে ধর্মে নতুন নতুন প্রতীকি আচার ঢুকল। দেহের ভিতর পঞ্চকোষে জ্ঞানের আলো জ্বলতে দেখা যেত। পরবর্তীকালে যখন আর তা দেখা গেল না তখন বাইরে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করার প্রথা চালু হল, এমনি আরও কত কী!

কিন্তু মানুষ প্রতীক পূজায় মেতে উঠে প্রতীকাপন্ন হয়ে প্রতীককেই ঈশ্বর ভেবে বসল। যেমন ঋষি বললেন, পরাবিদ্যা যা মানুষকে শুদ্ধ পবিত্র করে তার ধারক ও বাহক পরমহংস অবস্থাপ্রাপ্ত মানুষ। এরূপ মানুষের মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী চর্চাই ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ চর্চা তথা আরাধনা। বিদ্যা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ— তাই পরাবিদ্যার প্রতীক হল শ্বেতাম্বরা এক দেবীমূর্তি। তিনি পরমহংসের প্রতীক একটি হংসের উপর আসীন। এই হংসবাহনা দেবীরূপের মূর্তি গড়ে তাকেই বিদ্যার দেবী ভেবে তার পূজা শুরু হ'ল। ঐ দেবীরূপের প্রতীকার্থটি জেনে ঋষির প্রকৃত উপদেশ অনুধাবনের প্রয়াস দেখা গেল না।

আর্যদের মধ্যে নানা গোষ্ঠী থাকলেও তাদের ভিতর মিল ছিল। অপরপক্ষে নানা গোষ্ঠীর অনার্যদের মধ্যে ভিন্ন জাতিসত্তার বোধ ছিল প্রবল। সামাজিক রক্ষণশীলতা ও উন্নয়ণের পার্থক্য তাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার জন্ম দেয়। আর্যদের প্রাধান্য বিস্তার ও আর্য-অনার্য-দ্রাবিড় সমন্বয়ে এক জাতি সত্তা (হিন্দুজাতি) গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলে সামাজিক বিন্যাসের বিরাট পরিবর্তন ঘটল। জাতিভেদের কু-প্রথাও আর্যদের অনুমোদন পেল ও সকলে বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হল। গুণকর্ম অনুসারে সৃষ্ট বর্ণভেদের চরিত্র বদলে গেল। সামাজিক মর্যাদা ভেদে বহুস্তরীয় সমাজ গড়ে উঠল। অধিকাংশ অনার্য নিম্নবর্ণের শূদ্র বলে পরিগণিত হ'ল। মেথর, চণ্ডাল ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষরা শূদ্রর সম্মানও পেল না— হ'ল অস্পৃশ্য জাতি। শূদ্রদের পূজিত দেবতারা

স্বীকৃতি পেলেও হলেন নিম্নস্তরের দেবতা। যদিও এ বিষয়ে অনার্য দেবতা শিব একটি ভিন্নধর্মী তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি যথার্থই সর্বজনীন দেবতা (আর্য-অনার্য উভয়েরই) হয়ে উঠেছিলেন। তাই শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের তাচ্ছিল্যভরে বাঁ হাতে পুজো পেয়েই মনসা দেবী কৃতার্থ হন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্তরের বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়ায় ও ধর্মে তাদের স্বীকৃতি দেওয়ায় বৈদিক একেশ্বরবাদের ধারণা লোপ পেল এবং হিন্দুধর্মে অজস্র বিভাজন ও গোঁড়ামি ঢুকল, বিনষ্ট হ'ল বৈদিক সাম্যবাদ। ক্রমে বর্ণভেদ প্রথা সংকীর্ণ রূপ পেল। আর তাকে শাস্ত্রীয় অনুমোদন দেবার জন্য রচিত হ'ল মনুস্মৃতি*। 'তোমারেই যারা ভাগ করে কে তাদের দিবে ঐক্যধারা।' হিন্দু সমাজে দেখা দিল অনৈক্য তথা ধর্মগ্লানি। মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টির নানা সামাজিক বিধি— মানুষের অসম্মান। যে দেশে ঋষি বলেছিল, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু', সেখানেই আবার গরুকে বলা হ'ল ভগবতী। গোময় গোমূত্র খাইয়ে মানুষকে শুদ্ধ করার প্রথা চালু হ'ল।

।। ৩ ।।

বুদ্ধের জন্মের সমসাময়িক কালে ইউরোপে গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সেখানকার দার্শনিকরা দেবস্বপ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। স্বপ্নের উপর সক্রেটিসের বিশ্বাস কতখানি গভীর ছিল তা তার একটি স্বপ্নের উল্লেখেই স্পষ্ট অনুমিত হয়। মৃত্যুদণ্ডের নির্ধারিত দিনের আগের দিন প্রিয়জনেরা দেখা করতে এলে উনি বললেন, দেখ আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে দু'দিন পর। তারা বলল, আপনি কী করে নিশ্চিত হলেন যে এমন অঘটন ঘটবে। উনি বললেন, আমি যে এটা স্বপ্নে জেনেছি। স্বপ্নে দেখলাম— এক গৌরবর্ণা কমনীয় নারী শ্বেতবস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাকে ডেকে বললেন, এখন থেকে তৃতীয় দিনে তুমি সুন্দর তিয়ায় (স্বর্গে) যাবে। বাস্তবিক তাই-ই হয়েছিল।** গ্রীক মনিষীরাও বেদান্ত তত্ত্বের সুরে মানুষের

---

২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়।

**ওখানকার নিয়ম ছিল ক্রীট দ্বীপের দেলোগে তীর্থযাত্রা শুরু হলে নগরকে পবিত্র রাখতে হয়— জাহাজ ফিরে না আসা পর্যন্ত দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তির আদেশ কার্যকরী করা হয় না। কখনও কখনও প্রতিকূল বাতাসে জাহাজ আটকে গেলে ফিরতে দেরি হত। এটাই ঘটেছিল সক্রেটিসের ক্ষেত্রে।

জয়গান গাইলেন। মহান শিষ্য প্লেটোর সাথে মিলনের ঠিক আগেই দার্শনিক প্রবর সক্রেটিস স্বপ্ন দেখলেন— তার কোল থেকে একটি রাজহাঁস তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উড়ে গেল। বেদান্ত মতে সিদ্ধ হলে পরমহংস হয়। বেদান্তের সমতুল্য জ্ঞান তিনিও লাভ করেছিলেন যা তখন অন্যের মধ্যে বাক্যের দ্বারা সঞ্চালনের উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে জানা গেল। তাই দেখি সক্রেটিসের কথা, "Absolute equality and Abstract equality" যেন ঈশোপনিষদেরই প্রতিধ্বনি "সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ পরমব্রহ্ম (Absolute) ও অসংখ্য মনুষ্যদেহে হিরন্ময় কোষস্থ ব্রহ্ম (Abstract)" যোগ শাস্ত্রের উপমায়, আকাশে এক সত্য সূর্য ও অসংখ্য জলাশয়ে অসংখ্য প্রতিবিম্ব সূর্য। নব্যপীথাগোরাসীয় মতবাদে* বলা হল— "একত্বই ঈশ্বর।" স্বামীজিও বেদান্ত উদ্ধৃত করে বললেন "Religion is Oneness", অ্যারীষ্টটলীয় ঐতিহ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদের সুরে মানুষের রূপে (form-এ) আত্মাকে দর্শন করার কথাও বলা হল। ডেভিড হকিন্স লিখছেন— "In the Aristotelian tradition, the soul is described as the form of the body and by form is meant all the habitudes and capacities of that body." কিন্তু তার প্রমাণ ফুটল না জগতে।

আদিম গল্প গাথা ও দেবস্বপ্নের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা পুরাণ কাহিনীর প্রভাব অতিক্রম করে গ্রীক দর্শন গড়ে উঠেছিল যুক্তি ও বিচার বোধকে আশ্রয় করে। তাই তা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চর্চা হতে হতে ধীরে ধীরে মোড় নিল বাহ্যজগতের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে নানা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের দিকে। সেখানকার দার্শনিকরা হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

যদিও পুরাণের মোহ অতিক্রম করে পুরাণের প্রতীক সহযোগে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার রীতি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল সেখানে। হেলেনীয় যুগে কাব্য ও শিল্পচর্চার প্রেরণা ও উপাদান গৃহীত হ'ত স্বপ্ন থেকে। এমনকি দেখা যায় সম্রাট আলেকজাণ্ডার যুদ্ধে যাবার সময়ও সঙ্গে নিয়ে যেতেন একজন স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারকে।

একবার সম্রাট আলেকজাণ্ডার টায়ার নগরী অবরোধ করলে তাকে নগরবাসীদের তুমুল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় (৩২২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে)। সে সময় তিনি একরাত্রে নৃত্যরত ছাগমুণ্ড দেবতা স্যাটার (Satyr)-এর স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকার এ্যাবিস্টানড্রোস যিনি আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীর

পীথাগোরাসীয় দর্শন ও প্লেটোর দর্শনের সংমিশ্রণে উদ্ভূত দর্শন চিন্তা।

সঙ্গে যুদ্ধাভিযানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করেন দেবতার নামবাচক শব্দটিকে দু'ভাগে ভাগ করে, অর্থাৎ Satyros-কে Sa+tyros-এ ভাগ করে যার অর্থ দাঁড়ায় Tyre is thine অর্থাৎ টায়ার তোমার। এই থেকে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন টায়ার নগরের বিরুদ্ধে সম্রাটের জয় সুনিশ্চিত। তার এই ব্যাখ্যা যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করে। আলেকজাণ্ডার প্রচণ্ড অবরোধ চালিয়ে যান। শেষে তারই জয় হয় ও টায়ারের পতন ঘটে।

ভারতবর্ষেও বহু স্বপ্ন নির্দেশের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেগুলিকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে মানা হলেও স্থূল অর্থ করা হয়েছে। সেগুলিতে প্রতীক রহস্য ভেদ করার জন্য চুলচেরা বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায় না। তবে শুভ ও অশুভ কিছু প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়।

চিতোরের মহারাণা লক্ষণ সিংহ স্বপ্নে ঊবর দেবীর আদেশ পেয়ে আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন। আবার বাদশা জাহাঙ্গীর স্বপ্নে পিতার আদেশ পেয়ে আজিজ কোকার গুরুতর অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছিলেন। এরূপ অজস্র উদাহরণ উল্লেখ করা যায়।

যাইহোক প্রায় এক সহস্রাব্দব্যাপী গ্রীক সভ্যতার পতন হ'ল রোমান আক্রমণে (১৪৬ খৃঃ পূঃ)। রোমসম্রাট জাস্টিনিয়ান গ্রীক দর্শন চর্চাও নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু এই দর্শনচর্চার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল সমগ্র ইউরোপে। দুর্ভাগ্যবশত, স্বপ্নব্যাখ্যার কৃষ্টি একেবারে লুপ্ত হ'ল।

|| ৪ ||

ভারতে গ্রীসের মতো বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সূচনা হলেও এখানকার আবহাওয়ায় আত্মিক স্ফুরণ (ঈশ্বরীয় দর্শন) সহজ হওয়ায় আত্মিক ক্ষুধা বজায় থাকল। আত্মজিজ্ঞাসুদের মধ্যে অনুভূতিমূলক ধর্মের স্বরূপ খোঁজার সাধনা চলতে থাকল। ফলে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম ভারতের মাটিতে স্থায়ী হল না। হিন্দুধর্ম তাকে গ্রাস করল। অনার্য জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্মের চাপেই বৈদিক ধর্ম বাধ্য হয়েছিল দ্রাবিড়ী-কৃষ্টির সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে অর্থাৎ সেখানকার শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের সাথে রফা করতে। ফলে, বেদের ত্রিপুটির (জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা) ধারণা নতুন রূপ নিল। জন্ম নিল ত্রয়ীর (ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, মহেশ্বরের) ভাবনা। বেদের সূর্য দেবতা (সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ) ও বৈষ্ণবদের বিষ্ণুদেবতা মিলে মিশে এক হয়ে গেলে। অবতারবাদ গৃহীত হ'ল। বৈদিক ভাবনা প্রসূত মহাকাব্যিক চরিত্র রাম ও কৃষ্ণ অবতার রূপে গণ্য হ'ল। নতুন এই ধর্ম— আর্য, অনার্য ও দ্রাবিড়ীকৃষ্টির মিশ্রণে গড়া হিন্দুধর্ম, দ্রুত সর্বসাধারণের ধর্ম হয়ে উঠতে লাগল। বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে কালক্রমে মুছে গেলেও দীর্ঘদিন সহাবস্থানের ফলে তার বৈরাগ্য, তপশ্চর্যা* ইত্যাদি বহুবিধ ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক আচরণ বিধি (অহিংসা, সর্বজীবে দয়া, নিরামিষ আহার ইত্যাদি) ঠাঁই করে নিল হিন্দুধর্মে। নিরীশ্বরবাদী জৈন ধর্মাবলম্বীদের বৃহৎ অংশও হিন্দুদের সাথে মিশে গিয়েছিল।

৪র্থ শতাব্দীর সূচনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্ত সম্রাটদের সুশাসন ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের প্রভাব খর্ব করে ধীরে ধীরে তাদের হিন্দুধর্ম গ্রহণের পটভূমি রচনা করে। বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মে অন্তর্ভূক্তি ঘটেছে নানাভাবে। বৌদ্ধধর্মে তিনটি স্তর ছিল। শীর্ষস্থানীয় (Super class) যারা ছিল তাদের ধীরে ধীরে দমিয়ে দিয়েছিল বৈদিক কৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু ব্রাহ্মণেরা। তারা ঐসব শীর্ষস্থানীয় বৌদ্ধপণ্ডিতদের অনুভূতি দান করে নিজেদের মতের স্বপক্ষে টেনে এনেছিলেন। মানুষ নিজের ভিতর যখন দেখবে তখন তার বিরুদ্ধে যাবে কী করে? তারা আত্মিক অনুভূতি লাভ করতে লাগল বলে বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে দিতে লাগল। দ্বিতীয় স্তরকে বৈদিক কৃষ্টির অনুকূলে এনেছিলেন কুমারিল ভট্টের মতো পণ্ডিতেরা। কুমারিল ভট্ট (৭ম শতাব্দী) বৈদিক কর্মকাণ্ডকে সংক্ষেপ করে দিলেন। এর সঙ্গে ছিল হিন্দুদের নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য (যা বৌদ্ধ দর্শনের সদৃশ), পাতঞ্জল যোগদর্শন (বৌদ্ধ যোগসাধনা যার কাছে ঋণী), ভাগবত এবং গীতা। গীতায় অবৈদিক কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিষ্কাম কর্মযোগের** সংযোজন, পুনর্জন্ম ভাবনা ও পিণ্ডদান প্রথার স্বীকৃতি দান ও বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি বিরূপ মন্তব্য সম্ভবত লোকসংগ্রহের প্রতি লক্ষ্য

---

*বৈদিকযুগে গৃহীদের সন্ন্যাস অবস্থা লাভ অর্থাৎ অন্তঃসন্ন্যাস জনপ্রিয় ছিল। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি সকল ব্রহ্মবিদের স্ত্রী ছিল। বহু পরে বৌদ্ধশ্রমনদের ভাবধারায় হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসীদের জন্য সংসার ত্যাগ ও অন্যান্য কঠিন নিয়ম চালু হয়েছে।

**নিষ্কাম কর্ম হয় না। ঈশ্বর দর্শনের পর মানুষটা নিষ্কাম হতে পারে— শ্রীরামকৃষ্ণ।

রেখে অর্থাৎ বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য। অন্যদিকে ভাগবতেও বুদ্ধকে দশাবতারের অন্যতম এক অবতারের মান্যতা দান এই প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করেছিল। অবশেষে এলেন শংকরাচার্য্য (৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ)। তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানে তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধপণ্ডিতদের মত খণ্ডন করে বেদমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বৈদিক অদ্বৈতবাদের সাথে দ্বৈতবাদের ভক্তিরস মিশ্রিত করে পঞ্চদেবতার উপাসনা ও পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধি দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটালেন। মূলত বৈদিক কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠায় বৌদ্ধরা হিন্দুদের সাথে মিশে যেতে লাগল।* বৌদ্ধদের তৃতীয় স্তরে ছিল বজ্রযান সম্প্রদায়** যেটা পরে বৌদ্ধতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এরা খুব নেমে গিয়েছিল এবং ক্রমে হিন্দু তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যায়।*** ফলে হিন্দুতন্ত্রের মানও নেমে যায়। দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে বৌদ্ধধর্ম লোপ পেলেও বাংলায় বৌদ্ধরা মুসলিম আক্রমণের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ আরও প্রায় তিনশো বছর টিকে ছিল। বাবা সাহেব আম্বেদকারের মতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান ও পরে আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে ইসলামের অনুপ্রবেশ ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির কারণ।

।। ৫ ।।

সাধারণ মানুষের প্রকৃতিতে আছে ভক্তি। বৈদান্তিক জ্ঞানকে সহজবোধ্য

**বৌদ্ধধর্মে বহু দেবদেবীর উপাসনা ও মূর্তিপূজা চালু ছিল। ফলে মূর্তিপূজক হিন্দুদের সাথে তাদের মিলন সহজ হয়েছিল। অন্য অনেক মন্দিরের ন্যায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরও বৌদ্ধদের ছিল। পরে শঙ্করাচার্যের প্রচেষ্টায় (বৌদ্ধপণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে) সেখানে জগন্নাথ মূর্তি স্থাপিত হয় ও তা হিন্দুমন্দির হয়ে ওঠে। বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য বহু পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে।*

***বিশেষত বাংলা ও তার আশেপাশে যা জনপ্রিয় ছিল।*

****অবশিষ্ট বৌদ্ধ, যারা তথাকথিত নিম্নবর্গের হিন্দু থেকে বৌদ্ধ হয়েছিল তারা পরবর্তীকালে সম্মানের সঙ্গে হিন্দুধর্মে ঠাঁই না পেয়ে ইসলামের লোকশ্রুত সাম্যের প্রত্যাশায় মুসলমান হয়েছিল। মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধদের স্মৃতি থেকে তাদের অবজ্ঞাসূচক ‘নাড়িয়া’ বা ‘নেড়ে’ আখ্যা দেওয়া হয়।*

ও রসসিক্ত করে সর্বসাধারণের অনুশীলন যোগ্য করার জন্য প্রথমে প্রয়োজন অনুষ্ঠানের বাহুল্যবর্জিত বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ।

ইহুদীদের মধ্যে প্রথম এই ভক্তিবাদের, দাসভাবের সাধন ধারার উন্মেষ হয়েছিল। পুরো ইহুদী জাতটাই—শতাধিক বছর ধরে মিশরীয়দের ক্রীতদাস হয়ে থাকায় এই ভাবের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তারপর আবির্ভূত হলেন তাদের পরিত্রাতা ও ইহুদী ধর্মের জনক মজেস (সে আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে)। পরে সল, সলেমন ডেভিড, ড্যানিয়েল ইজাকিয়েল ইত্যাদি অনেকে এই ধারার পরিপুষ্টি ঘটান। তারা ভক্তিবাদের উপর বহু জনপ্রিয় গান রচনা করে গেছেন। মিশরীয়দের কাছ থেকে পাওয়া দেবস্বপ্নের প্রতীকি বিশ্লেষণের সংস্কৃতিও* যুক্ত হয়েছিল তাদের ভক্তিবাদের চর্চায়।

তাই মিশরে ফ্যারাওয়ের রাজসভায় যোসেফের স্বপ্নব্যাখ্যার বিস্তৃত বিবরণ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেণ্টে। পরবর্তীকালে এই ইহুদী কৃষ্টি থেকে সৃষ্ট খ্রীষ্টধর্ম ও মুসলমান ধর্মেও স্বপ্নকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কোরাণ ও হাদিসেও দেবস্বপ্নের মহম্মদকৃত অনুপম ব্যাখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝেই মহম্মদ তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কিনা জানতে চাইতেন। নেতিবাচক উত্তর পেলে বলতেন, ‘দেহ শুদ্ধ না থাকলে স্বপ্ন দেখবে কি করে?’ তাঁর এই কথা থেকে তিনি স্বপ্নকে কী চোখে দেখতেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

২০০০ বছর আগে রোমান আক্রমণে প্যালেস্টাইনের পতন হলে কিছু ইহুদী এসে আশ্রয় নিল দক্ষিণ ভারতে। এরা খুব আবেগপ্রবণ ছিল। আবেগ ও ভক্তিপ্রধান দ্রাবিড়ী কৃষ্টির সাথে সহজেই তাদের ভাবধারা মিশে গেল। এ যেন ‘ভক্তিকাল্টের’ পরাগ সংযোগ ঘটল। কালে তা ফল প্রদান করেছিল। প্রথমে তাদের ভক্তিবাদে বিশেষভাবে প্রভাবিত হ’ল দক্ষিণ ভারতের

**প্রাচীন মিশরে স্বপ্ন দেখাবার মন্দিরও ছিল (তারকেশ্বরে হত্যে দিয়ে স্বপ্ন নির্দেশ পাবার মত)। মন্দিরের অনেক কাজের মধ্যে একটি ছিল স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা। ইহুদীদের রাজা ব্যালসাজারের ভোজসভায় দেওয়াল গাত্রে ফুটে ওঠা ইঙ্গিতপূর্ণ চিহ্নগুলির প্রতীকার্থ উদ্ধার করেছিলেন ড্যানিয়েল।*

আলভাররা (নিম্নবর্গের তামিল শৈব সাধকরা)। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানরা দক্ষিণ ভারতে ব্যবসা করতে এল। তারাও ছিল ভক্তিবাদী। তারাও এখানকার ভক্তিবাদকে প্রভাবিত ও পুষ্টিদান করেছিল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচয়িতা শংকরাদি পাঁচজন আচার্য (শংকরাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য) অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের নানা তত্ত্ব গড়ে তুলে যথার্থ ভক্তিবাদের বিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছেন। তারা সকলেই আলভারদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমনকি রামানুজ আলভারদের লেখাগুলিকে বেদতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন। এখান থেকে পরে ভক্তিবাদ যায় উত্তর ভারতে। চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী ও মঙ্গোলিয়ান মুসলিমরা (খিলজী ও মোগল বংশ) ভারতবর্ষ অধিকার করল। এদের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সাথে অর্থাৎ সুফীবাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে ভক্তিবাদ ছড়িয়ে পড়ল উত্তর ভারতে। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ সমগ্র উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বভারতে ছড়িয়ে দিলেন রামানন্দ, কবীর, রুইদাস, নানক, দাদূ, তুকারাম, শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি মহান আচার্যরা। এদের প্রভাবে সমাজের নীচুতলার মানুষের কাছেও পৌঁছাল এই ভক্তিবাদ।* স্বামীজীর মতে রামানুজের সময় থেকেই (একাদশ শতাব্দী) হিন্দু ধর্মের দ্বার সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

বৈধীধর্মের ঊর্ধ্বে সহজ রাগানুগা ভক্তির প্রবক্তা তথা 'ভক্তির অবতার' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতেই (১৪৮৫-১৫৩৩) এই ভক্তিবাদ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাল। তিনি বললেন, "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস" আর তার কর্তব্য হল— 'কীর্তনীয়া সদা হরি।' নিজ জীবনে তা করে দেখালেনও। তাঁর প্রেমের মন্ত্রে উদ্বেলিত হল আসমুদ্র হিমাচলের জনচিত্ত। মানুষী তনুতে পরম পুরুষকে খোঁজা অন্য এক মাত্রা পেল। তার অন্যতম পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা পরিপুষ্ট হ'ল বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা**। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার সাথে তন্ত্র ও সুফী সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভব হল বাউল

**নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি ধর্মাচার্যের উপর ইসলাম ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।*

***যার বীজ ফেলেছিলেন কবি জয়দেব এবং যা অঙ্কুরিত হয়েছিল চণ্ডীদাসের জীবনে।*

সংস্কৃতির। ঈশ্বর প্রেমে পাগল এই বাউলের দলের মানুষরতন তথা মনের মানুষকে খোঁজার সাধনা সাধারণ মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতেও জাগালো সুর— 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।'

ভগবান কোন মানুষের দেহে প্রকাশ পেয়ে তাঁকে সে যুগের আদর্শ করে লীলা করেন— একে বলে কৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাঙালীর নিজস্ব কৃষ্টি বিশিষ্ট রূপ লাভ করল। ভাষা এই কৃষ্টির বাহক। স্বাভাবিকভাবেই তার জীবন ও ভাবধারা অবলম্বন করেই বাংলাভাষা প্রথম সাহিত্যের অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করল।* অন্তরে অনুরণিত প্রেমের বাঁশরীধ্বনি পেল বাণীরূপ। কৃষ্ণকথা পেল গৌরচন্দ্রিকা।

তাঁর দেহে আত্মিক স্ফুরণের বিবরণ থেকে জানা যায় নিমাই পণ্ডিতের রাতারাতি ভাবে গর্গর মাতোয়ারা গোরাচাঁদে রূপান্তরের রহস্যের মূলে আছে একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্নে মন্ত্র পেলেন এবং তাঁর চেতনার জগতে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।** শেষজীবনে নীলাচলে থাকার সময় নৌকাবিহার, রাসলীলা ইত্যাদি প্রায় সমগ্র ভাগবতের অনুভূতিই তাঁর লাভ হয়েছিল স্বপ্নের মাধ্যমে।***

**প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একজন অশিক্ষিত পুরোহিত স্বপ্ন দেখে কবিতায় বাইবেলের অনুবাদ করায় (Dream of the Rood) ইংল্যাণ্ডে ধর্মসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল।*

***বেদান্তের কিছু অনুভূতি হবার পর অবতারতত্ত্বের সাধনে তাঁর চৈতন্য কৃষ্ণরূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছিল— তাই তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।*

****উপনিষদ দেবস্বপ্নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও স্বপ্নের প্রতীকতত্ত্বের যথাযথ অনুশীলনের অভাবে স্বপ্ন নির্দেশের সঠিক অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ধর্ম ভাবনায় নানান বিকৃতি ঘটেছিল প্রতিটি সাধন ধারায়। আর সবচেয়ে বেশী বিকৃতি ঘটেছিল তন্ত্রের আচারে। কোন এক তান্ত্রিক হয়ত স্বপ্ন দেখলেন, মা কালী বলছেন, তিনটি নরবলি দিলে সিদ্ধিলাভ হবে। তিনটি নরবলির প্রকৃত তাৎপর্য হ'ল স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর অতিক্রম করে মহাকারণে লয় হলে তবে সাধনায় সিদ্ধি অর্থাৎ পূর্ণতা লাভ হবে। প্রতীক রহস্য ভেদ করতে না পারায় তান্ত্রিকটি সত্যি সত্যিই নরবলি দিতে উদ্যত হ'ত।*

।। ৬ ।।

সর্বদা রাধাভাবে বিভাবিত গোরাচাঁদ কৃষ্ণনামে ভক্তির বন্যা বইয়ে দিলেন. কিন্তু কালীভক্ত, শিবভক্ত, রামভক্ত, ব্রহ্মউপাসক ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে শুদ্ধাভক্তির সুধাধারায় অবগাহন করানোর জন্য প্রয়োজন হ'ল নতুন মানুষের, সমন্বয়ের অবতারের।

চৈতন্যলীলার তিনশ বছর পর আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬)। দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈদিক কৃষ্টির অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাংলাদেশে। এর সুফল মিলল ঊনবিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মূর্ত সাধনে। মহাপ্রভু রচিত ভক্তির বেদীতে তিনি স্থাপন করলেন অন্তরের দর্শন-লব্ধ জ্ঞানের মহিমা। হ'ল জ্ঞান ও ভক্তির তথা বেদান্তের সোহম জ্ঞানের সাথে অবতারতত্ত্বের পাকাভক্তির যথার্থ সমন্বয়। তিনি একাধারে পরমহংসদেব আবার অবতার বরিষ্ঠ। তিনি জগৎকে উপহার দিলেন এক অনবদ্য নূতন ভাগবত— তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী, অনুভূতি ও উপলব্ধির সংকলন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। কথামৃত পাঠশ্রবণে মানুষ অনুভব করে "যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভাগবত কথা কহিতেছেন"। পরীক্ষিতের দল মুক্তির দিশা পায়।

সেই সময় ইউরোপ থেকে বিজ্ঞানের আলো এসে পড়ল ভারতবর্ষে। প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় করে তাকে প্রসন্ন করার নানা ধর্মীয় প্রথার কুসংস্কার সাধারণ মানুষের মন থেকে দূর করতে সাহায্য করল। অপর পক্ষে শিক্ষিত সমাজ প্রস্তুত হ'ল সায়েন্স না পড়া অজ পাড়াগ্রামে মানুষ হওয়া এক মহাপ্রাণকে বরণ করার জন্য, যার মধ্যে ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত অধ্যাত্ম সাধনা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মাত্র এগারো বছর বয়সে কামারপুকুর থেকে আনুড়গ্রাম যাবার পথে মাঠের মাঝেই জ্যোতিদর্শন করে সমাধি হ'ল বালক রামকৃষ্ণের। তখন থেকে তিনি অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। নিজের ভিতরে আর একজনকে সর্বদা অনুভব করতে লাগলেন। অতঃপর প্রাণশক্তির অন্তর্মুখী স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে বেদমতে সপ্তভূমির সাধন হল তার। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। প্রেমের পর বস্তুলাভ। চৈতন্যের প্রেম হয়েছিল। এ যুগে হল বস্তুলাভ। শুধু

গৌরচন্দ্রিকা নয়, আভাস ইঙ্গিতে নয়, কৃষ্ণ অর্থাৎ আত্মার সংকলন ও সাক্ষাৎকার ঘটলো শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে। বললেন, মাইরি বলছি— ভগবানকে দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি, হাতের পাখাখানা যেমন স্পষ্ট দেখছি তেমনি স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখেছি। কী করে বুঝব তা মনের খেয়ালে নয়? অমনি বললেন, কেউ একজন এসে দেখিয়ে বলে দেবে, 'এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন', তবে জানবি ঠিক ঠিক। এই 'কেউ' হলেন সচ্চিদানন্দগুরু।

তোতাপুরীর সান্নিধ্যে হল তাঁর বেদান্তের সাধন তথা অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা। আবার অবতারতত্ত্বের সাধন শেষে দেখলেন দেহের ভিতর চৈতন্য ছোট্ট দেহী বরবেশী "মানুষরতনের"* রূপ ধরে সর্বদা হরিনাম করছেন— জাগল পরাভক্তি, মিলল ভক্তিবাদের সুপক্ক ফল। হলেন পুরাণমতে অবতার।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন— 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ।' একথা বলার পর তিনি এক মধ্যমার সৃষ্টি করলেন, ঘোষণা করলেন, 'অবতারকে দেখাও যা ভগবানকে দেখাও তা।' তবে অবতারের চিন্ময় রূপ দেখা চাই ভিতরে। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বললেন, 'মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। সচ্চিদানন্দই গুরু। আমাকে যদি স্বপ্নে ধর্ম উপদেশ দিতে দ্যাখো জানবে সে সচ্চিদানন্দ।' স্বপ্ন দর্শনের উপর নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করে বললেন, 'স্বপন কি কম গা!' 'স্বপ্নসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার ঠাঁই।' ছোট নরেনের আপাত তুচ্ছ এক স্বপ্নের অসাধারণ ব্যাখ্যা করা, তাঁর জন্মের পিছনে পিতা ক্ষুদিরাম চ্যাটার্জীর দেখা স্বপ্ন শোনানো ও তাঁর ঈশ্বরলীলার সূচনায় কাপ্তেনকে স্বপ্নে গোবরে পদ্মফুল দেখানোর ঈঙ্গিতটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া নিঃসন্দেহে ভারতীয়দের বহু কুসংস্কার কাটাতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু স্বপ্ন যে মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্বের প্রকাশ— বৈদিক যুগ থেকে গড়ে ওঠা এই ধারণা টলে গেল। ফ্রয়ডিয়ান তত্ত্বের সাহায্যে দেবস্বপ্নকেও অবদমিত কামনার

বাউল গানে আছে, এই মানুষে আছে রে মন যারে বলে মানুষরতন। মানুষরতন দর্শন হলে অবতারত্বে অধিষ্ঠান হয়। মানুষ রতনের কথা প্রথম বলেন চণ্ডীদাস।

প্রতিফলন বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা শুরু হ'ল বুদ্ধিজীবী মহলে।* তাই স্বপ্ন প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ যে নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করলেন সেকালের মানুষের মনে তা যথেষ্ট দাগ কাটতে পারে নি।

যাইহোক, শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর জীবদ্দশায় স্বামীজী, শ্রীম, বাবুরাম মহারাজ, রামবাবু প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে লাভও করেছিলেন। প্রচলিত গুরুগিরির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির দিশা পেল জগৎ। আর কাল্পনিক দেবদেবীর স্থলাভিষিক্ত হলেন একজন জীবন্ত মানুষ। গিরিশ ঘোষের দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি! তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্তি) দেখছি। কখনও মাস্টার মশাইকে বলছেন, তুমি আমার নাম করবে আর পল্টুকেও আমার ধ্যান করতে বলবে।

মহাপ্রভু পর্যন্ত পূর্ববর্তী সকল আচার্য নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করে একটি করে ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। কেউ বললেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করাই পথ, কেউ বললেন আল্লা আল্লা করাই একমাত্র পথ, কেউ বললেন, রাম রাম করাই পথ ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সে পথে না হেঁটে ঘোষণা করলেন, জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ। ভগবান দর্শন হলে জানবে "এক রাম তার হাজার নাম।" ধর্মের পথ নতুন মোড় (turn) নিল। সংকীর্ণতা পরিহার করে সকল মত ও পথের সমন্বয়ের দিগদর্শন করালেন তিনি। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে আত্মিক একত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রেক্ষাপট রচনা করলেন। তাই খৃষ্টান মিশ্রবাবু তাকে যিশুরূপে, দেবেনবাবু কৃষ্ণরূপে, গোপালমা গোপাল রূপে, মথুরবাবু কালী ও শিবরূপে তাঁকে দর্শন করলেন। এরূপ বহু মানুষের দর্শনে নরলীলার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

মনিষী রোমা রোঁলা যথার্থই লিখেছেন— "শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ভারতের বহু শতাব্দীর সাধনার ফল। শুধু অতীত যে তাঁর জীবনে পরিসমাপ্তি

**মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সিগমণ্ড ফ্রয়েডের ৩০০ জন রোগীর স্বপ্ন নিয়ে গবেষণার বিশেষ স্বপ্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে সাধারণ স্বপ্ন বিশ্লেষণ তত্ত্ব দাঁড় করানো যায় না বলে দাবী করেছিলেন তারই প্রধান ও প্রিয় ছাত্র ইয়ুঙ। অবশেষে ফ্রয়েড স্বীকার করেছেন যে তিনি যেসব স্বপ্নের কথা বলেছেন (জৈবীস্বপ্ন) তার বাইরে অন্য একরকম স্বপ্ন (দেবস্বপ্ন) আছে যার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।*

ও সার্থকতা লাভ করেছে তাই নয়— ভবিষ্যৎও পেয়েছে সেই দিব্যজীবনের মধ্যে সূচনা ও প্রেরণা। বৃক্ষের সমস্ত মাধুর্য আহরণ করে বৃক্ষের জীবনকে সার্থক করে উৎপন্ন হয় সুমিষ্ট ফল। সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একাধারে ভারতের অতীতব্যাপী সাধনার ফল এবং ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্কুরিত বীজ।"

।। ৭ ।।

১৯০০ সালে আমেরিকায় "বেদান্ত কি ভবিষ্যৎ ধর্ম"— শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'মহাপুরুষের আর্বিভাবের শুভ সময় সমাগত, যিনি প্রচলিত ধর্মসমূহে যে অ-আ-ক-খ পাঠ চলছে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সৃষ্টি করবেন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, শক্তিশালী, সত্যকার ধর্ম তথা আত্মার দ্বারা আত্মার পূজা।' এই আত্মিক অনুভূতিমূলক ধর্মের ভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-পরবর্তী ভবিষ্যৎ ধর্মের স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল। প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্মুখী বিকাশের বৈদিক সাধন ধারার প্রভাবে তন্ত্র ও সাংখ্য থেকে উদ্ভূত যোগ দর্শনের একটি ধারা উচ্চতর অধ্যাত্ম ভাবনার জন্ম দিয়েছিল— সেটি হ'ল রাজযোগ*। রামকৃষ্ণ গ্রথিত সাধনমালায় পরবর্তীকালে এটি সংযুক্ত হয়ে নতুন এক আধারে বিকশিত হ'ল, পরিণতিতে নতুন আধ্যাত্মিক আলোকবর্তিকার জন্ম হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ যাবার মাত্র ৭ বছর পর এলেন নতুন মানুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তিনি ১২ বছর ৪ মাস বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে লাভ করেছিলেন। ঠাকুর স্বপ্নে ফুটে উঠে তাঁকে শিক্ষা দিলেন। ১৩ বছর ৮ মাস বয়সে স্বপ্নে দেখলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। তিনি সারারাত ধরে শিয়রে বসে শিক্ষা দিলেন। ভোর হলে তিনি অদৃশ্য হলেন, মাথায় ধ্বনি ও লেখা ফুটে উঠল 'রাজযোগ'।

*যোগ চার প্রকার। হঠযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ (বা ভক্তি যোগ) ও রাজযোগ। রাজযোগ— যে যোগের দ্বারা আপনা হতে এই স্থূলদেহ থেকে প্রথমে সিদ্ধকায়া তা থেকে দিব্যতনু পরে প্রণবতনু অবশেষে চৈতন্যময় শাশ্বততনু জন্মলাভ করে তাকে রাজযোগ বলে।

এই রাজযোগের উপর ভিত্তি করেই বেদের সাধন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। জাস্টিস্ উডরফ্ "সারপেণ্ট পাওয়ার" গ্রন্থে লিখেছেন— Samadhi in Rajayoga is complete."

তারপর শুরু হল দর্শন আর অনুভূতির বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। স্বয়ম্ভু আত্মার স্বয়ং প্রকাশ হয়েছে তাঁর মধ্যে। সাধন ভজনের কোন কথা কখনও তাঁর মনে উদয় হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীতে আমরা পাই— ঠাকুর মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন, কাঁদছেন আর বলছেন— "রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি, মা আমায় দেখা দিবি নে?" কিন্তু শ্রীভগবানকে যে দেখা যায়, শ্রীভগবানকে দেখার জন্য যে কাঁদতে হয় তাই তাঁর জানা ছিল না। জীবনে পূজা করেন নি কখনও, একটা মন্ত্রও জানা ছিল না। যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া জীবনে আর কিছু তিনি জানতেন না সেই ঠাকুরের চরণে কখনও একটা ফুলও অর্পণ করেন নি— ভোগরাগ, জপতপ তো দূরের কথা। চাকরী করে খেয়েছেন। সাধারণ মানুষের মতই দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন আর দেখতেন— আপনা হতে অনুভূতি হয়ে চলেছে।

কিন্তু ভক্তিবাদের গভীরে তন্ত্রের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রবৃত্তি ঠাঁই করে নিয়েছিল এর জন্মলগ্ন থেকেই। শ্রীরামকৃষ্ণ চৌষট্টিটি তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করে পরে 'তন্ত্র পথ নোংরা পথ, এ যেন পায়খানা ঘরের মধ্যে দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢোকা'— বলে তন্ত্রকে বর্জন করেছেন।

মহাপ্রভু সম্পর্কে বলেছেন, চৈতন্যও শক্তির আরাধনা করেছিল। অর্থাৎ আত্মার প্রকাশের জন্য দেহের উপর জোর খাটিয়ে ছিলেন। ঐযে, উদ্দাম নৃত্য সহযোগে সংকীর্তন করেছিলেন! আবার বলেছেন— আমায় কঠোর সাধন করতে হয়েছিল। কিন্তু নিত্যসিদ্ধের সাধন করতে হয় না। এ যেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ সম্বন্ধে তার ভবিষ্যৎবাণী। সচ্চিদানন্দগুরু লাভে দেহে আপনা হতে সাধন হওয়াই বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ। এতে তন্ত্রের কৃচ্ছ্রসাধনের কোন যোগ থাকে না অথচ তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। দেহ থেকে আত্মিক শক্তি মুক্ত হয়ে চিন্ময় দেহ নিয়ে (ইষ্টমূর্তিতে) ভগবৎলীলা মূর্ত হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দগুরু ইষ্টের স্থলাভিষিক্ত হ'ন। এদিকে আবার অজানা মানুষ রূপে সচ্চিদানন্দগুরু আবির্ভূত হয়ে বেদের সাধন করিয়ে দিয়ে আত্মা সাক্ষাৎকার করালে ওজনে কম পড়ে। সেটি যোলআনা আত্মাসাক্ষাৎকার নয়— তাতে বেদের সাধন পূর্ণতা পায় না। বিশ্বব্যাপীত্ব লাভ হয় না। এর জন্য দরকার জানা মানুষের রূপে সচ্চিদানন্দগুরুর প্রকাশ। অবতার পুরুষ অন্যের অন্তরে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে ফুটে উঠতে পারেন। তাই বৈদিক ধর্মের সুপক্ক ফসল

ঘরে তুলবার জন্য ভারতবর্ষকে অপেক্ষা করতে হ'ল একজন অবতার পুরুষের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত যার দেহে অবতারতত্ত্বের সাধনের সাথে সাথে বেদ মতের সাধনও বিশেষত আত্মা সাক্ষাৎকার হয়েছে। প্রতীক্ষার অবসান ঘটল শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। এই শ্রীরামকৃষ্ণকে ষোলআনা সচ্চিদানন্দগুরুরূপে পাওয়ায় ও রাজযোগ হওয়ায় আপনা হতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে একে একে বেদের সাধন, বেদান্তের সাধন, অবতার তত্ত্ব ও রসের সাধন পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠল। এরই অত্যাশ্চর্য পরিণতি স্বরূপ অফিসে, পাড়ায়, দূরদূরান্তের পরিচিত-অপরিচিত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁকে স্বপ্ন দেখতে লাগল ও সেকথা তাকে জানাতে লাগল। তাদের অনেকে তাঁর ঘরে এসে তাঁর মুখ থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ শুনতে লাগল। কথামৃতে ঠাকুরের কথার রেফারেন্স ধরে উনি বললেন, তাঁকে এভাবে দেখা মানে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ। ক্রমে তাঁকে দেখা লোকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। বিশেষত ১৯৫৩ সালে অবসর গ্রহণের পর নিত্য বহু মানুষ আসতে লাগল।

তার ঘরে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত রামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও তার যোগাঙ্গের ব্যাখ্যা হত। শ্রোতাদের বিচিত্র স্বপ্নে কথামৃতের যোগের কথাগুলি কিভাবে ফুটে উঠেছে তা তিনি ধরিয়ে দিতেন। রামকৃষ্ণের উপমাগুলি যেন টাইম বোমা। এযুগে তা অনুভূতি হয়ে ফুটতে লাগল। দেখা গেল স্বপ্নেই তন্ত্র, বেদ, বেদান্ত ও অবতারতত্ত্বের অনুভূতি হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপ্নসিদ্ধের কথা বলে গেছেন কিন্তু স্বপ্নে যে সব রকম সাধন হওয়া সম্ভব তা জগতের মানুষ সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করতে লাগল এযুগে।

আবার দেখা গেল, একজনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা সমর্থন করছে তারই পরবর্তী স্বপ্ন অথবা অপর একজনের স্বপ্ন। স্বপ্নেই কোন মানুষের আত্মিক অবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে অপরকে। কেউ বা পাচ্ছে ব্যবহারিকে সৎপথে চলার দিশা। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের যেমন অভিনব স্বপ্নের জোয়ার বইতে লাগল তেমনি আবার সেই সকল স্বপ্নের দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তার ভিতরের মাধুর্য ধরিয়ে দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের জয়গানে তিনি মুখর হলেন। দেবস্বপ্ন বিশ্লেষণ করে আত্মিক রহস্য উদঘাটনের চাবিকাঠি পেল জগৎ। অনুভূতিমূলক ধর্মের চর্চার জগতে সাধারণ মানুষের প্রবেশ ঘটল। ব্যষ্টিতে আবদ্ধ ধর্ম সমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ল, ধর্ম সর্বজনীন রূপ পেল।

তার ঘরে মেয়েদের আসা নিষেধ ছিল তবু মেয়েরা ঘরে বসেই তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে বলে জানাতে লাগল। ওনার মাসীর বাড়ী আলপুকুরে। সেখানকার একজন মুসলিম ভদ্রলোক, নাম গোলাম হোসেন খাঁ, খুব অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে স্বপ্নে দেখে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তার বোধ হল ইনিই এ যুগের নবী। পরে এক স্বপ্নে দেখলেন ভারতের সব তীর্থ পরিভ্রমণ করলেন, সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। অর্থাৎ শ্রীজীবনকৃষ্ণের ধর্মপথ পরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছে, তিনি এবার অন্যদের পথ প্রদর্শক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এতদিন কৌমার বৈরাগ্যবান কিছু ছেলেদের নিয়ে তিনি ঈশ্বরীয় চর্চা করতেন কিন্তু এবার সংসারীদেরও ঘরে ঠাঁই দিলেন। শুধু মুসলমান নয়, খৃষ্টান নলিনীবাবু, পার্শী জাহাঙ্গীর বাটলিওয়ালা ও তার বন্ধুরাও তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করল। ১৯৫৭ সাল থেকে তাকে আর গুরু নয়, ভগবানরূপে দেখা শুরু হ'ল। প্রথম দেখলেন হাওড়ার অসীম বিশ্বাস। স্বপ্নে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখিয়ে বলছেন— ও ভগবান। উনি গুরুত্ব দিলেন না। কলকাতার অবলাকান্ত দত্ত দেখলেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণের পাঁচটি মাথা অর্থাৎ তিনিই কাশ্মিরী শৈববাদ কথিত পঞ্চানন শিব। ঘাটশিলার দ্বিজেন বাবু স্বপ্নে দেখলেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণ সহস্রশীর্ষ পুরুষ। চিত্তবাবু দেখলেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণের সারা দেহটায় চোখ অর্থাৎ তিনি সহস্রচক্ষু পুরুষ। শ্রী অভয়পদ মুখোপাধ্যায় দেখলেন, সূর্যের মধ্যে ধ্যানমগ্ন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ঈশোপনিষদ কথিত সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ রূপে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন দেখা গেল? তবে কি ইনি বেদমতে পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর অবস্থা লাভ করেছেন? সালিখার জিতেন চ্যাটার্জী স্বপ্নে দেখলেন জীবনকৃষ্ণ বলছেন, 'আমিই পরমব্রহ্ম। পূজা জপ ধ্যান যা করার আমাকেই কর।' এ যেন গীতায় উল্লেখিত কৃষ্ণের উক্তি "সর্বধর্মাণ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

মহাবোধি সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট আর্যদেব এলেন তার ঘরে। দেখেই চমকে উঠলেন। আরে এনাকেই যে তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় ম্যাজিনো লাইনে দেখেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন কর্ণেল। নাম ছিল পল অ্যাডাম্। কাতর প্রার্থনা জানালেন যীশুখৃষ্টের কাছে। এই যুদ্ধ থামিয়ে দেবার, পৃথিবীতে শান্তি আনার আর্তি জানালেন। দেখলেন জ্যোতির্ময় এক পুরুষ ন্যাড়া মাথা, ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত, তার সামনে এসে বললেন, এই যুদ্ধ থেমে যাবে,

যুদ্ধ থামলে তুমি ভারতবর্ষে এসো আমার কাছে। তারপর অদৃশ্য হলেন। পল্ অ্যাডাম্ ভারতে এসে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে হলেন আর্যদেব। জীবনকৃষ্ণ তাকে প্রশ্ন করলেন আমাকে এত মানুষ নানাভাবে স্বপ্নে দেখে কেন? আপনার কি কোন উত্তর জানা আছে? উনি বললেন, হিন্দুধর্মে এর উত্তর আছে। বিষ্ণুকে বলে স্বপ্নেশ্বরনাথ। আপনার বিষ্ণুত্ব লাভ হয়েছে, তাই এমনটা হচ্ছে।

কিছুদিন পর আমেরিকার হনলুলু থেকে মেরোজী দম্পতির চিঠি এল— তারা জীবনকৃষ্ণের Religion and Realisation বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। স্বপ্নে লেখককে দেখেছেন, স্বপ্নেই জেনেছেন তার পরিচয়।

জগতের সাধারণ মানুষ অন্তরে দর্শন করে জানতে ও জানাতে লাগলেন তাঁর স্বরূপ। তিনি নেতি নেতি করে এসব অগ্রাহ্য করে এই সমস্ত দর্শনের ভিতর সত্য অনুসন্ধান করতে করতে নতুন করে আবিষ্কার করলেন বৈদিক সত্য— একং সৎ। সকলের মধ্যে একজনই আছে, বহু নেই আছে এক। প্রমাণ সাপেক্ষে এই একই সত্য।

তাই তিনি বললেন, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য আর ভগবান দর্শন নয়, জীবনের উদ্দেশ্য এই একের একত্ব (ব্রহ্মত্ব) লাভ করে মানুষ বাইরে বহু কিন্তু আত্মিকে এক— এই জ্ঞান লাভ। তাঁর উপলব্ধির আলোয় তিনি লিখলেন "ধর্ম ও অনুভূতি" এবং Religion and Realisation নামক দুটি গ্রন্থ। অতঃপর দেবস্বপ্ন বিশ্লেষণ ও ঐ গ্রন্থ দুটি অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত বাণীর যোগাঙ্গা অনুশীলনের মাধ্যমে এই সত্যধর্মের চর্চা ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশেও গড়ে উঠল শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত যোগাঙ্গাসহ কথামৃত অনুশীলনের পাঠচক্র এবং দেবস্বপ্ন বিশ্লেষণের নতুন ধারা।

এই পর্বে, ১৯৬৬ সালে, ইংল্যাণ্ডের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে সুব্রত ব্যানার্জী "One and Oneness" শীর্ষক বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেলেন। সেখানে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ব্যষ্টির সাধনের চরম উৎকর্ষতা লাভ করে আত্মিকে পরম এক হয়ে ওঠা ও তার প্রমাণ স্বরূপ তার একত্ব বা ব্রহ্মত্ব বহুর মধ্যে তাঁরই চিন্ময় রূপ ধরে ফুটে ওঠার কথা ঘোষণা করলেন। কী আশ্চর্য, প্রশ্নোত্তর পর্বে এক মধ্যবয়স্কা ইংরেজ মহিলা সুব্রতবাবুর কপালে

শ্রীজীবনকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখেছেন বলে জানালেন। আর একজন ভারতীয়, অসমঞ্জ মুখার্জীও বক্তৃতা চলাকালীন হলের মধ্যে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখেছেন বলে জানালে শ্রোতারা হতবাক হয়ে গেলেন। ছান্দোগ্য বলেছেন, প্রসন্নতা প্রাপ্ত মানুষ দেহাভ্যন্তরে পরম জ্যোতি বা আত্মা দর্শন করেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তাঁর চিন্ময়রূপ অন্তরে দর্শন করেন ও তাঁর ব্রহ্মত্ব লাভের প্রমাণ দেন। জৈমিনী বলেছেন তাঁকে দেখা লোকের সংখ্যা বিশ হাজার হলেও হবে না, সংখ্যাতীত হওয়া চাই। এগুলি এতদিন কথার কথা হয়েই ছিল— জীবনকৃষ্ণের জীবনে তথা জগতে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, "এতদিনে আমি কে আর আমার সামনে এই মনুষ্যজাতি— এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী— এই প্রশ্নের মীমাংসা হল। আমি আর জগতের মানুষ এক। কোথায় এক— না, আত্মিক জীবনে।" ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার এক অধ্যায় এখানে পূর্ণতা পেল। ব্যষ্টির সাধনের চরম উৎকর্ষতা (ব্রহ্মত্ব) লাভ করার পর তাকে অগ্রাহ্য করে সমষ্টির সাধনে বহুত্বে একত্ব প্রতিষ্ঠার পথে যাত্রা শুরু হ'ল। ব্যক্তিপূজা তথা Hero Worship-এর যুগ শেষ হ'ল।

বীরভূমের সুরুল গ্রামের ফজলুল হক স্বপ্নে দেখলেন— চারিদিক জঙ্গলে ভরা, নোংরা, তারই মাঝে আদিম অসভ্য মানুষ কাঁচা মাংস খাচ্ছে। হঠাৎ সেখানে ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত এক বাঙালী ভদ্রলোক এলেন। কী আশ্চর্য, ভোজবাজির মত সব বদলে গেল। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন— সেখানে সবাই সভ্য মানুষ। আধুনিক কালের একটি ভোজসভায় যোগ দিয়েছে তারা। চেয়ার টেবিলে বসে কাঁটা চামচে খাচ্ছে। স্বপ্ন ভাঙল। পরে ফটো দেখে বুঝল স্বপ্নদৃষ্ট ঐ বাঙালী ভদ্রলোক শ্রীজীবনকৃষ্ণ। বেদমতে আদিপুরুষের আবির্ভাবে মানুষের ব্রেণ ক্যাপাসিটি বাড়ে ও আধুনিক সভ্য মানুষের (হোমোসেপিয়েন্সের) জন্ম হয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে অসাধারণ আত্মিক বিকাশ ঘটায় ও মনুষ্যজাতির মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ায় চেতন জগতে নতুন এক স্তরে মানুষের উত্তীর্ণ হবার মহালগ্ন আজ আবার উপস্থিত। আত্মিকে তার একত্ব লাভ করে ব্যক্তিগতভাবে বহু মানুষের শিবত্ব (ব্রহ্মত্ব) লাভের পথে চলা শেষ হয়। শুরু হয় নতুন পথে চলা। সেখানে সম্মিলিতভাবে বহু মানুষের স্বপ্নের অনুভূতি থেকে শিক্ষা নিয়ে মনুষ্যজাতির মধ্যে একজন

মানবেরই অস্তিত্ব অনুভব করা যায় ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে সেই বোধের প্রতিফলন ঘটে। জেগে ওঠে নতুন কৃষ্টি, যথার্থ ঐক্যমূলক এক জীবনচর্যা, খুলে যায় চেতনার উচ্চস্তরে উত্তরণের স্বর্ণদুয়ার।

।। ৮ ।।

একজনের ব্রহ্মত্ব লাভ হলে সেই ব্রহ্মত্বের আলো বিকিরিত হয় অসংখ্য মানুষের মধ্যে, কোন সাধন ব্যতিরেকেই তারা তাঁর ব্রহ্মত্বের তথা একের একত্বের মাধুর্য আস্বাদন করে। এটি বোঝাতেই প্রচলিত রীতিতে একজন পুরোহিত পুজো করে অনেকের হয়ে। অন্যেরা প্রসাদ পায়। এই ব্যষ্টির সাধনকে সর্ব্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ায় হিন্দুধর্মকে সর্বজনীন ধর্ম (Universal Religion) বিবেচনা করা হত না। অপরদিকে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মে সাধারণের অংশগ্রহণ স্বীকৃত হওয়ায় সেগুলিকে Universal Religion ভাবা হত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, একজন আগুন করে আর দশজনে পোহায়। মহর্ষি পতঞ্জলিও বলেছেন, আকাশে এক চন্দ্র। অসংখ্য জলাশয়ে অসংখ্য প্রতিবিম্ব চন্দ্র। প্রতিবিম্ব চন্দ্রও আকাশের চন্দ্রের গুণ পায়। একের দেবত্ব সর্বশ্রেণীর অসংখ্য মানুষের মধ্যে চিন্ময় রূপ ধরে প্রকাশ পেয়ে আত্মিক একীকরণ তথা মনুষ্যজাতির এক অভিন্ন সত্তার উপলব্ধিই ধর্ম। One and Oneness-ই বেদান্তের মর্মবাণী বলে তুলে ধরলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তখন থেকে বেদান্ত ধর্ম বিশ্বে Universal Religion হিসাবে স্বীকৃত হ'ল। ব্যষ্টিকে কেন্দ্র করে যে সমষ্টি চৈতন্যের আভাস ফুটে উঠে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে* তারই পূর্ণরূপ ফুটল শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে। সম্ভবত আত্মিক জগতে এরূপ বিশ্ব মানবের উদ্দেশ্যেই "মানুষের ধর্ম" বইতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ— তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই— মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে।..... সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাকে পাবে আশা করে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে— স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া

মা বললে, তুই এত মুখে খাচ্ছিস আর একটা মুখে নাইবা খেলি— শ্রীরামকৃষ্ণ।

সংযুনক্তু। সেই মানব, সেই দেবতা, যিনি এক, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির দ্বারা এক করুন।" আমরা দেখছি এতদিনে সূচনা হ'ল অনেকে সম্মিলিতভাবে বহুর মাঝে এককে, অখণ্ড চৈতন্যকে, জানার পথে এগিয়ে চলা। সর্বজনীন মানব শ্রীজীবনকৃষ্ণ সকলের মধ্যে নিজেকে দর্শন ও অনুভব করে আত্মিক চেতনার শীর্ষস্তরে পৌঁছেছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের সমষ্টি চেতনা মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে বহুমানুষের চেতনায় ধীরে ধীরে বহুত্বে একত্বের বোধ জাগরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরিণতিতে অহং-এর আবরণ ভেদ করে অন্যের মধ্যে নিজের আত্মিক সত্তাকে দর্শন ও অনুভব করার শক্তিলাভ করছেন অনেকে। শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্থূল দেহাবসানের (১৯৬৭) পরও মনুষ্যজাতির মধ্যে বিলীন তাঁর শাশ্বত সত্তার ক্রিয়া চলেছে। আজ আরও বেশি সংখ্যায় মানুষ তাঁকে অন্তরে দর্শন করছেন। আর তাই সকল মানুষ তাঁকে ভেতরে দেখুক বা না দেখুক, একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, আত্মিক একত্বলাভের পথে মনুষ্যজাতির যে যাত্রা শুরু হয়েছে ভবিষ্যতেও তা চলবে অব্যাহত গতিতে। এই পথের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সুস্পষ্ট ধারণাদায়ী এক বিশেষ মাত্রায় জগৎ যেদিন পৌঁছাবে সেই শুভদিন আর খুব দূরে নয়। তাই পিপাসী অন্তরে নতুন তাৎপর্যে গুঞ্জরিত হয় কবির বাণী— "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।"

— তথ্য সূত্র —

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত — অখণ্ড সংস্করণ — শ্রীম কথিত।

২। ধর্ম ও অনুভূতি — কুড়িয়ে পাওয়া মানিক।

৩। স্বপ্ন (উপক্রমণিকা) — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ফাল্গুন, ১৩৫১।

৪। Plato– Alexi Losev Aza Takho– Godi, Progress Publishers.

৫। আচার্য শঙ্কর — স্বামী অপূর্বানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়।

৬। স্বামীজীর বাণী ও রচনা — উদ্বোধন কার্যালয়।

৭। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, তারকচন্দ্র রায়।

৮। মনসমীক্ষণের ভূমিকা স্বপ্ন — সিগমুণ্ড ফ্রয়েড।

৯। ফা-হিয়েনের দেখা ভারত — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়
— ফার্মা কে এল এম পাইভেট লিঃ।

১০। ট্রাজেডির জন্ম — ফ্রেডরিক নীৎসে, অনুবাদক — উৎপল কুমার বসু।

১১। মাণিক্য — ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১৪১, ১৪২ সংখ্যা।

১২। বঙ্গদর্শন, ২য় খণ্ড, থার্ডমিলেনিয়াম কমিটি ফর সোশ্যাল ট্রানজিশন।

১৩। Dreams, Miracles and Supplication in Islam – Md. Zamir.

১৪। সংরক্ষণ ও জাতপাত — খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক — সঞ্চয়ণ প্রকাশনী।

১৫। বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা — প্রধান সম্পাদক,
ড. অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় — নবপত্র প্রকাশন।

১৬। মানুষের ধর্ম — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭। স্বপ্ন প্রতীক — কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ। ভাষান্তর —
অরূপরতন বসু — দীপায়ণ প্রকাশনী।

১৮। ভারতীয় জনতার মানবায়ন ঃ সমস্যার সূত্রগুলি —
পবিত্র সরকার — সিধো কানহু স্মরণিকা — ২০০৪
— বীরভূম জেলা আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

১৯। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনজীবনে পূজা-পার্বন —
প্রমোদ নাথ — অর্পিতা প্রকাশনী

২০। হিন্দু ধর্ম — অজিত কুমার চক্রবর্তী — বুদ্ধিজীবির নোটবই
— সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী — পুস্তক বিপনী।

২১। বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন — ড. অতুল সুর — সাহিত্যলোক।

২২। হিন্দু ধর্ম — ক্ষিতিমোহন সেন — আনন্দ পাবলিশার্স।

২৩। স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য।

২৪। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা — গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।

২৫। রাজগুরু যোগীবংশ — শ্রী সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার।

২৬। সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু — প্লেটো— অনুবাদ — সুধাকান্ত দে
— ন্যাশান্যাল বুকট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী।

২৭। বাঙালীর ইতিহাস— আদিপর্ব— নীহার রঞ্জন রায়— দেজ পাবলিশিং।

বিচিত্র সাধ

মানুষের মনে কত কি সাধ জাগে তার বৈচিত্রের ইয়ত্তা নেই। তবে কবি, বিজ্ঞানী, সাধারণ মানুষ, ভক্ত মানুষ ইত্যাদি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সাধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে বৈকী। নব যুগের প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মনে জেগে ওঠা বিচিত্র সাধগুলি আমাদের কৌতুহল উদ্রেক করে।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, (বিজয়াদির প্রতি) — মনে চারটি সাধ উঠেছে। বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব। শিবনাথের সঙ্গে দেখা করবো। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে দেখবো। আর আট আনার কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকেরা পান করবে তাই দেখবো আর প্রণাম করবো। কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও সমাধিস্থ হইলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুতে একটি পা বাড়াইয়া দিয়া ওই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য, চক্ষু স্পন্দনহীন।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২/১৬/১

আপাতদৃষ্টিতে এই সাধগুলি অতি সাধারণ মানুষের সাধ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন দেখি সাধগুলির কথা বলেই তিনি সমাধিস্থ হচ্ছেন, তখন এগুলি যে মহাযোগীর সাধ এবং এর কোন গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান এ বিষয়ে সংশয় থাকে না। এখন সাধগুলির প্রকৃত অর্থ বোঝার চেষ্টা করা যাক্।

১। তিনি বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খেতে চান — পরমহংসের একী কামনা? তবে কথাগুলির যৌগিক রূপ বিচার করলে এর সুন্দর একটি অর্থ পাওয়া যায়। মাছ হ'ল আত্মার প্রতীক। বেগুন মানে গুণ নাই যার অর্থাৎ গুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তম— এই তিনগুণের অতীত। ঠাকুর ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করতে চান। ভজনানন্দ বা ষষ্ঠভূমিতে কারণ শরীরের লীলা দর্শনে (ইষ্ট মূর্তি দর্শনে) কারণানন্দ লাভে তিনি তৃপ্ত নন।

২। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপ করবে — তিনি দেখবেন। এ তো সাধারণ ভক্তের সাধ! ঠাকুরের প্রকৃত সাধটি কি? ঠাকুর নবযুগের প্রবর্তক। নতুনের দিশারী। মালা জপার মধ্যে পুনরাবৃত্তির ভাবটি তার অন্তরের সুরের সাথে মেলে না। তিনি ঘোষণা করেন, বাদশাহী আমলের টাকা নবাবী

আমলে চলে না। যুগোপযোগী নতুন লীলার প্রকাশ ঘটে। There cannot have any tradition in religion. কেননা ভগবান অনন্ত, অসীম, তিনি চিরনতুন। নতুনের আহ্বানে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়াই ধর্ম— চরৈবেতি। ঠাকুর একটি গল্পে এই কথাটি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। তিনি বললেন,

এক কাঠুরে কাঠ কেটে খেত। একদিন এক বহ্মচারীর সাথে দেখা হল। ব্রহ্মচারী তাকে বলল, "এগিয়ে পড়।" কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে চন্দনগাছের বন দেখতে পেল। চন্দন কাঠ বিক্রি করে অনেক টাকা হ'ল। কিছুদিন পর ভাবলো ব্রহ্মচারী তো এগিয়ে যেতে বলেছে। তাই সে আরও এগিয়ে গেল ও রূপোর খনির সন্ধান পেল। পরে আরও এগিয়ে ক্রমে সোনার খনি, হীরে, মণি-মাণিক্য ইত্যাদি পেল।

বাদশাহী আমলের টাকা নবাবী আমলে চলে না, মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না, মা বাহ্য পূজা উঠিয়েছ, সব কামনা যেন না যায়, কালে প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল ইত্যাদি কথায় তার নূতন পথে এগিয়ে চলার সুরটি অনুরণিত হয়েছে।

ঠাকুর মা ঠাকরুণকে যোড়শী পূজা করে শেষে নিজের জপের মালাটিও তাকে দান করলেন। তার জীবনে জপতপের ইতি ঘটল। একদিন হাজরাকে হরিনামের মালা জপ করতে দেখে তার সামনে বসে বললেন, আমার জপ হয় না। পরে হাজরার জপের মালা নিজের হাতে নিয়ে জপ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জপ শুরু করতে গিয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। (কথামৃত-২/১৭/৩) আবার একদিন অধর সেনের বাড়ী যাবার পথে ভাবস্থ হয়ে বললেন, আমি মালা জপবো, হ্যাক থু! আর একদিন হাজরা মশাইকে মালা জপতে দেখে বললেন, মা, কী হীনবুদ্ধি, এখানে এসেও মালা জপছে? এখানে যে আসবে তার একেবারেই চৈতন্য হয়ে যাবে। কলকাতায় তো হাজার হাজার লোক মালা জপ করছে, খানকি পর্যন্ত! ঈশান মুখুজ্জের মতো এক নিষ্ঠাবান আচারী বাহ্মণের উদ্দেশ্যে বলেছেন— তিরিশ বছর মালা জপে তবু কিছু হয় না কেন?

রামদত্ত স্বপ্নে ঠাকুরের কাছে মন্ত্র পেয়েছিলেন। সেই ভক্ত রামদত্ত একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসে একমনে জপ করছেন— ভক্তদের উদ্দেশ্যে বিতরিত ঠাকুরের অমূল্য বাণীতে কর্ণপাত না করে। হঠাৎ ঠাকুর বললেন, রাম

আমার মন্ত্র ফিরিয়ে দাও। রামবাবু বিস্ময়ে বিমূঢ়। বললেন, তাহলে আমি কি নিয়ে থাকবো? ঠাকুর বললেন, কেন, এখানে আমার কাছে যারা আসে সেইসব ভক্তদের সেবা করবে, এখানকার কথা চিন্তা করবে, তাহলেই হবে। তাই পরবর্তীকালে স্বামীজী সাধন করার কথা বললেই রামবাবু বলতেন, আমরা তাঁর সঙ্গ পেয়েছি আমাদের আবার সাধন ভজনের কি দরকার?

শুরু হ'ল রামকৃষ্ণ যুগ। মালা জপা নয়, লোক দেখানো ধর্ম নয়, রামকৃষ্ণ অনুধ্যানই বড় কথা। তাতে তাঁর সাধনের ফল লাভ হবে। রাখাল (পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ) একদিন ঠাকুরকে বললেন, জানেন, আজ সারাদিন ঘুরে ফিরে মনে শুধু আপনারই চিন্তা হয়েছে। শুনে তিনি বললেন, সব মনটা গুটিয়ে যদি আমাতে এল তাহলে বাকী কী রইল। মাইরী বলছি আমাকে যে চিন্তা করবে সে আমার সত্তা পাবে। যেমন বাপের সম্পত্তি ছেলে পায়।

ভক্তের দল মালা জপবে তিনি দেখবেন। অর্থাৎ তিনি একজন ভক্তকে কৃপাদৃষ্টি দান করে উত্তীর্ণ করে দিতে চান ভক্তির জগৎ থেকে জ্ঞান-ভক্তির জগতে। তাদের জানাতে চান ভগবান যুগে যুগে নতুন নতুন লীলা করেন, একই লীলার পুনরাবৃত্তি হয় না। চৈতন্যলীলার পর নতুন লীলা শুরু হয়েছে—রামকৃষ্ণলীলা। বলরাম বসুর পিতাকে লক্ষ্য করে তাই ঠাকুর বললেন, বৈষ্ণবদের বড়ো দীনহীন ভাব, তারা কেবল মালা জপে, কেঁদে কঁকিয়ে বলে, হে কৃষ্ণ দয়া করো, আমি অধম, আমি পাপী! এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! রাতদিন হরিনাম করে আবার বলে আমার পাপ! —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (০৪/১৫/০৪)

৩। আট আনার কারণ তন্ত্রের সাধকেরা পান করবে তাই দেখবো আর প্রণাম করবো।

ঠাকুর কারণবারি পান করা দেখবেন কেন? চৌষট্টিটি তন্ত্র সাধন যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করলেও ঠাকুর কখনও কারণবারি পান করেননি। শেষদিন ভৈরবীর একান্ত অনুরোধে কারণবারির মধ্যে একটি আঙুল ডুবিয়েই তুলে নিলেন। ভৈরবী এতেই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি নিজে খাচ্ছেন না অথচ অপরে কারণ পান করবে আর তিনি তা দেখবেন কেন? আসলে ঠাকুর এখানে স্থূল অর্থে কারণ পানের কথা বলেন নি। কারণ বা মদ হ'ল অহং-এর প্রতীক। তন্ত্রের

সাধনে আটআনা অর্থাৎ আংশিক অহং নাশ হয়। ঠাকুর চান এই সত্য জগৎ তাঁর চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করুক। ঠাকুরের কাছে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভৈরবী যোগেশ্বরী এলেন তন্ত্রসাধন শিক্ষা দিতে। তিনি চৌষট্টিটি তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছেন। ঠাকুরের সাধন শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে ঠাকুরকে প্রণাম করে যোগেশ্বরী বললেন, বাবা, তুমি পূর্ণ, আমি অপূর্ণ। সবকটি তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ যোগিনী নিজেকে দ্বিধাহীন চিত্তে অপূর্ণ বলে ঘোষণা করছেন। ঠাকুরের পূতঃ সান্নিধ্যে তার মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশ পেল। জানা গেল, তন্ত্র সাধনায় পূর্ণতা লাভ করা যায় না।

তন্ত্রের সাধকরা কারণ পান করবে ঠাকুর তাই দেখবেন আর প্রণাম করবেন। এখানে প্রণাম করবেন মানে বিদায় জানাবেন। ভারতীয় ঐতিহ্যে কাউকে বিদায় জানাতে প্রণাম বা নমস্কার জানানোর প্রথা আছে। ঠাকুর বুঝলেন তন্ত্র সাধন পূর্ণাঙ্গ নয় এবং এতে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। তাই তন্ত্রের সকল ধারাগুলি নিজে সাধন করে, আধিকারীক পুরুষ হয়ে জগৎকে এর স্বরূপ জানালেন এবং এই পথ পরিহারের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, তন্ত্রপথ নোংরা পথ। এ যেন পায়খানার ভিতর দিয়ে ঘরে ঢোকা।

৪। 'শিবনাথের সাথে দেখা করবো।'

ঠাকুর কি শিবনাথ শাস্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাইছেন?

শিবনাথ শাস্ত্রী কিন্তু ঠাকুরের অন্তরঙ্গ নন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'যাকে অনেকে গণে মানে তার মধ্যে সার আছে।... কেশবের মধ্যে কিছু সার আছে বৈকি। কত লোক কেশবকে খোঁজে, কই শিবনাথকে তো কেউ খোঁজে না।' শিবনাথও ঠাকুরকে অবতার বলে মানেন না। এমনকি ঠাকুরের সমাধিকে বলেন, মৃগীরোগ। তবুও শিবনাথকে দেখলে ঠাকুর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হন। একবার একই গাড়িতে উঠে শিবনাথের বাঁপাশে বসে মাথায় ঘোমটা টেনে সলজ্জভাবে চলেছেন কলকাতা অভিমুখে। আড়চোখে শিবনাথের দিকে তাকান আর মিটিমিটি হাসেন। বিব্রত শিবনাথকে ঠাকুর বললেন, আমি যে তোমার প্রেমিকা গো! বলেই শিবনাথের হাত চেপে ধরে সমাধিস্থ হলেন। শিবনাথ ঠাকুরের ব্যবহার কিছু বুঝে উঠতে না পেরে তাকে ছেলেমানুষী আখ্যা দিয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিবনাথকে দেখে ঠাকুরের মধ্যে প্রকৃত শিবের উদ্দীপনা হত। ঠাকুরের জীবনে অনুরূপ অভিজ্ঞতার আর একটি দৃষ্টান্ত

স্মরণ করা যেতে পারে। আলিপুর চিড়িয়াখানায় গেছেন ঠাকুর। সিংহের দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র সিংহবাহিনীর উদ্দীপনা হ'ল ও সমাধিস্থ হলেন। সিংহদর্শন আর সম্পূর্ণ হ'ল না। ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

তাই এখানে 'শিবনাথের সাথে দেখা করবো' একথার মানে, নিজের শিবস্বরূপের পরিচয় প্রত্যক্ষ করবো অর্থাৎ শিব অবস্থা প্রাপ্ত হব। শিব ঐক্য স্থাপনে। যিনি বহুত্বে একত্ব স্থাপন করেন।

বাল্যকালে কামারপুকুরে এক শিবচতুর্দশীতে যুগীদের শিবমন্দিরে শিবঠাকুরকে জীবন্ত হয়ে মাথা নাড়তে দেখেছিলেন। এখান থেকে সূচনা হয়েছিল জীব সত্তার শিবে রূপান্তরের। দক্ষিণেশ্বরেও শিবদর্শন হয় তাঁর। পরে কাশীতে গঙ্গাবক্ষে নৌকার মধ্যে থেকে দেখলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বিরাট শিব। তিনি মৃতদের কানে তারকব্রহ্ম নাম দিয়ে মুক্ত করে দিচ্ছেন। একটুপর ঐ শিবমূর্তি শূণ্যে ভেসে এসে ঠাকুরের দেহে মিলিয়ে গেল। ঠাকুর শিব হলেন, অপরের মধ্যে এর প্রকাশ শুরু হ'ল। দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবু দিবালোকে স্পষ্ট দেখলেন বারান্দায় পায়চারীরত ঠাকুর একবার শিব হয়ে যাচ্ছেন আবার ঠাকুর হচ্ছেন।

কিন্তু এও তো প্রতীক দর্শন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যেহেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেই জন্যই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে। ঠাকুর শিব হতে চাইছেন মানে তিনি মনুষ্যজাতির সাথে আত্মিকে এক হতে চাইছেন। নরেনের হাঁটুতে পা ঠেকিয়ে সমাধিস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটিতে হয়তবা ঠাকুরের এই আকাঙ্খাই জীবন্ত রূপ পেয়েছে। তাঁর এই কামনা পূরণের আভাস ফুটে উঠেছিল কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এক দিব্যদর্শনে। ঠাকুর স্বামীজীকে বললেন, তোর কথায় মাকে বললাম, মা লরেন বলছিল যাতে কিছু খেতে পারি। মা বললেন, তুই এতমুখে খাচ্ছিস, আর একমুখে নাই বা খেলি। ঠাকুর এখন চাইছেন তার নিজের এই বিশ্বব্যাপীসত্তার পূর্ণ প্রকাশ হোক, অপরের মধ্যেও তার সেই পরিচয় পরিস্ফুট হোক। তিনি সেই শিবনাথের তথা নিজের সেই শিবসত্তার দেখা পেতে চাইছেন।

এখন বোঝা গেল উপরিউক্ত সাধগুলি একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্য সাধারণ জীবনের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাধনক্রম

জীব শিবে পরিবর্তিত হয়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বলে সাধন। সাধনের এক একটি ধাপ সম্পূর্ণ হলে বিশিষ্ট এক বা একাধিক অনুভূতি হয়। এখানে সাধনার বিভিন্ন ধাপগুলি উল্লেখ করা হ'ল।

বেদমতের সাধন

মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম* হলেও তার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্ব থাকে সুপ্ত। কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রে আপনা থেকে তা ধাপে ধাপে প্রকাশ পায়। মনুষ্যদেহে প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আত্মা বা ব্রহ্মে রূপান্তরিত হওয়ার এই ধারাটি বোঝাতে বেদ দেহকে পাঁচটি কোষে ভাগ করেছে। যথা— অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় কোষ। পাঁচটি কোষের মধ্যে আছে সাতটি ভূমি— লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য এবং সহস্রার।**

বেদ কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নয়, বেদ সর্বজনীন, তাই বেদ কথিত সপ্তভূমির অনুভূতি হয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি সব সম্প্রদায়ের লোকেরই।

হযরত মহম্মদ আল্লার কাছে গেলেন সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ করে (মে'রাজ দর্শনে)।

বাইবেলেও আছে— ঈশ্বরের সপ্তদূত একে একে তূরী বাজালে স্বর্গে বাণী ফুটে উঠল— এখন জগতের রাজ্য প্রভুর হইল। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী নিপতিত হইল ... ইত্যাদি।

প্রতি ভূমির সাধন শেষে এক বা একাধিক বিশিষ্ট অনুভূতি হয়।

সাধনের সূচনায় একজন অজানা মানুষকে দেখা যায়। তিনি বাইরে থেকে আসেন না। ব্রহ্মপুর অর্থাৎ দেহীর সহস্রার (শিরোদেশ) থেকে চিদ্‌ঘনকায়ে নেমে এসে দেহীকে কৃপা করেন। দেহীর মনকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে যান, অনেক অনুভূতি দান করেন, শেষে ভগবান দর্শন করান।

ব্রহ্ম কথার অর্থ বৃহৎ, যে বৃহতের ইতি নেই।

***এই ভূমিকে চক্রও বলে। তন্ত্র মতে দেহে ষট্‌চক্র। তবে বেদমতের সাধনই পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ। ষট্‌চক্র হল (১) মূলাধার (২) স্বাধিষ্ঠান (৩) মণিপুর (নাভি) (৪) অনাহত (হৃদয়) (৫) বিশুদ্ধচক্র (কণ্ঠ) ও (৬) আজ্ঞাচক্র (ভ্রূ-মধ্য)।*

ইনিই সচ্চিদানন্দগুরু অর্থাৎ গুরুরূপে শ্রীভগবান। ইনি প্রধানত স্বপ্নে আবির্ভূত হন।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— স্বপ্নে যদি আমাকে উপদেশ দিতে দেখ, জানবে সে সচ্চিদানন্দ। যার ষোলআনা বা পূর্ণাঙ্গ সাধন তার বারো বছর চার মাস বয়সে এই সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়। কুণ্ডলিনী জেগে ওঠে।

বেদ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছে— বিদ্বতে বস্তুলাভ— বিবিদিষায় নয় (কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা নয়)। বস্তু কি না ঈশ্বরবস্তু।

বৎসরাধিক কাল পর আর এক রাত্রে অন্য এক রূপে সচ্চিদানন্দগুরু আবির্ভূত হয়ে সম্পূর্ণ রাজযোগ শিক্ষা দেন। সাধকের অবশ্য সে সব কথা মনে থাকে না। শেষে মাথায় ধ্বনি ও লেখা ফুটে ওঠে— **রাজযোগ**। দেহটি সাধনের উপযোগী হয়ে ওঠে। শুরু হয় ভূমি কোষের সাধন।

পঞ্চকোষের মধ্যে প্রথমটি হল অন্নময় কোষ— এই স্থূল দেহ যা অন্ন অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণে পরিপুষ্ট হয়। এই কোষে কোন ভূমি নাই। প্রথমে স্থূল দেহেতে মন থাকে। দেহীর মন তখন বহির্মুখী, জাগতিক বিষয়ে লিপ্ত, দেহসুখের অভিলাষী। এরপর যখন মন অর্ন্তমুখী হয়, প্রাণশক্তি অন্নময় কোষ থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণময় কোষে আসে।*

প্রাণময় কোষে আছে তিন ভূমি— লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি। এখানে মন এলে প্রাণশক্তিকে প্রথম দেখা যায় প্রতীকে জল রূপে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— আলেখলতার জল পেটে পড়লে গাছ হয়। আলেখলতা— অলক্ষ্যে দেহকে যে নির্গুণব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে লতার মতন জড়িয়ে আছেন তিনি দেহ থেকে কৃপা করে মুক্ত হয়ে পেটের ডান দিকে স্বচ্ছ নীলাভ জল রূপে জ্যোৎস্নাকিরণে বিজড়িত হয়ে দেখা দেন। সাধনার (সাধনবৃক্ষের) সূচনা হয়।

একে বলে ব্রহ্ম বারি। পুজোর সময় প্রথমে ঘটে বারি আনতে হয়— সে এই দেহঘটে ব্রহ্মবারির কথা। দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতিতে স্বপ্নে দর্শন হয়— পরিষ্কার জল টল্‌টল্ করছে— তাতে মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। চৈতন্যের প্রথম প্রকাশ প্রতীকে মাছ রূপে— মৎসাবতার।

**পূজোয় ব্যবহৃত কোষাকুষি প্রতীকে এই পরিবর্তনকেই সূচিত করে।*

এরপর প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বমুখী হয়, মন উঠে আসে মনোময় কোষে— চতুর্থভূমি— হৃদয়ে। এখানে মন এলে চারিদিকে জ্যোতিদর্শন হয়। যেখানে দৃষ্টি পড়বে দেখা যাবে সবকিছু ঈশ্বরীয় জ্যোতি দ্বারা আবৃত। একটা গাছের ডালে হয়ত নজর পড়ল— ডালের উপর পারা বা রূপা গলার মতন দেখা গেল। ভক্ত দেখেন মাটির প্রতিমার মুখ জ্বলজ্বল করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের ঘরে পুজো করছেন। মা সহসা দেখিয়া দিলেন— কোষাকুষি, বেদী, মার্বেল পাথর, চৌকাঠ সমস্ত চিন্ময়, জ্যোতির্ময়। আসলে দ্রষ্টার নিজের মধ্যে যে আত্মিক জ্যোতি তাই তার চক্ষু থেকে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ তার নিজের চৈতন্যেই জগৎ চৈতন্যময় দেখছেন। ঠিক যেমন চোখে ন্যাবা লাগলে মানুষ চারিদিক হলুদ দেখে।

এই ভূমির দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হল— দীপশিখা, মশালের আলো, আগুন বা উদীয়মান সূর্য দর্শন।

এছাড়া এই ভূমিতে মন উঠলে সূক্ষ্মশরীর লাভ হয়। সাধক স্বপ্নে দেখেন তিনি উড়ে উড়ে যাচ্ছেন। নিজের ঐ হালকা দেহ হল সূক্ষ্মশরীর। কখনও ধ্যানে দেখা যায় নিজের মূর্তি সামনে এসে বসল। তবে আকারে সব দিক থেকে সামান্য ছোট।

মনোময় কোষ থেকে প্রাণশক্তি এবার উঠে আসে বিজ্ঞানময় কোষে। এই কোষ পঞ্চমভূমি, ষষ্ঠভূমি ও সপ্তমভূমির কিয়দংশ নিয়ে গঠিত। এই কোষে বিশেষ রূপে জ্ঞান হচ্ছে— আমি কে?

পঞ্চম ভূমির স্থান— কণ্ঠ।

অনুভূতি— অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন। দ্রষ্টা দেখেন নিজের উপরার্ধ পুরুষ ও নিম্নার্ধ নারী। চোখ বুজে নয়— চোখ চেয়ে অবাক হয়ে। দেহী বোঝেন তিনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, তিনি আত্মা। আত্মার লিঙ্গভেদ নেই।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তির দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হল সচ্চিদানন্দগুরুর অর্ধনারীশ্বর রূপ।

তাই সচ্চিদানন্দ প্রথমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিধারণ করলেন— শ্রীরামকৃষ্ণ।

সচ্চিদানন্দ-আত্মা-ভগবান-ব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দ দেহেতে। তিনি দেহ থেকে মুক্ত হয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করেন।

এই ভূমিতে অন্যান্য অনুভূতি হল— বীণার মধুর ঝংকার, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ (যে কারণে মন্দিরে ইষ্টমূর্তি দর্শনের আগে ঘণ্টাধ্বনি করার প্রথা আছে।) ও অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রতীক নীল আকাশ দর্শন। সম্ভবত এই অনুভূতি নীলকণ্ঠ শিবের সমুদ্র মন্থনে উত্থিত বিষ কণ্ঠে ধারণ করে জগৎকে রক্ষা করার পুরাণ কাহিনীর জন্মদাতা। জীব স্বরূপত শিব। কণ্ঠে মন এলে ঈশ্বরীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা বলতে বা শুনতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে তাহলে সেখান থেকে উঠে যায়। অন্যাং বাচো বিমুঞ্চথ— গীতা। আর ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তনে ও শ্রবণে শিবত্বের প্রকাশ ঘটে ও সংসার সমুদ্রের দুঃখ দহন জ্বালা সহ্য করার শক্তি লাভ হয়।

এরপর মন উঠে আসে ষষ্ঠভূমিতে— ভ্রূ-মধ্যে, কপালে। একে দ্বিদল পদ্ম বলে। প্রথম স্তরের অনুভূতিতে দেখা যায় আধ ইঞ্চি ব্যাসের জ্যোতির্ময় দুটি চক্র দুটি চক্ষু থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বে ভ্রূ-মধ্যে এসে এক হয়ে যায়, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। পরক্ষণে সেখানে একটি মাত্র চক্র দেখা যায়, যার ভিতরে থাকে ছোট্ট সোনার বুদ্ধমূর্তি— জ্ঞানের মূর্তি। এই চক্রকে বলে জ্ঞানচক্ষু বা তৃতীয় নয়ন বা উপনয়ন।

এই ভূমিতেও দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি আছে। সচ্চিদানন্দগুরুর শরীরে জ্ঞানচক্ষু পরিস্ফুট হয়। আবার বহুবিধ দেবদেবীর রূপ (কালী, কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি) দর্শন হয় দ্রষ্টার কারণশরীরে বা ভাগবতীতনুতে। কিন্তু এসবই সংস্কারজ কল্পিত রূপ দর্শন— একে ইষ্টমূর্তি দর্শন বলে। তন্ত্রের ষোল আনা সাধনে সাধক দেখেন গুরু ইষ্টকে দেখিয়ে দিয়ে ইষ্টের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। পরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কেটে মহাকারণে লয় তন্ত্রের সাধকের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু বেদমতের সাধনে ইষ্ট গুরুর দেহে লীন হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, ইষ্টমূর্তি দর্শন হল কানার হাতি দেখা— কেউ বলে হাতি কূলোর মতো, কেউ বলে থামের মতো, কেউ বলে দড়ির মতো ইত্যাদি— অর্থাৎ আংশিক ভগবান দর্শন। কখনও জ্যোতি দেখা যায়। এই ভূমির দর্শনে আংশিক সমাধি হয়— একে বলে উন্মনা সমাধি।

অর্ধবাহ্যদশায় সাধক ভিতরের সব দর্শনকে বাইরে বিক্ষেপ করে দেখেন।

তার মনে হয় তিনি বাইরে দেখছেন। ঠাকুরের দেহ থেকে কালপুরুষ বের হ'ল। তিনি মাকে বললেন, মা, ওকে, কেটে ফেল। মা খাঁড়া দিয়ে কালপুরুষকে কেটে ফেললেন, কিন্তু কই রক্ত পড়ল না তো? আসলে দর্শনটি হচ্ছে ভিতরে। এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় বহু পরে বেদান্ত সাধনের সময়।

এখনও সাধকের মন মায়ার এলাকার মধ্যে। এরপর মায়া কৃপা করে দ্বার ছেড়ে দিলে মন ষষ্ঠভূমি ছেড়ে সপ্তমভূমিতে উঠে পূর্ণ ভগবান দর্শন হবে।

এরপর নৃত্যপরা রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন হয়। অপূর্ব সুন্দরী এক নারীমূর্তি। গায়ের রং— স্নিগ্ধ ঘাসফুলের রং (ফিকে বেগুনী)। বসন ফিকে নীলাম্বরী। নাসায় নীল পাথরের বেশর। দৃষ্টি ভূমিতে আনত ও আবদ্ধ। ভ্রু-মধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নৃত্যরতা। আনন্দ যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে উচ্ছলিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আনত ও আবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন মায়া রহস্যময়ী। তার সবটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয়— রহস্য ঘেরা। অনুভূতির দ্বারা মায়ার রহস্য ভেদ হবে।

সপ্তমভূমির দ্বারদেশে— কপালের উপরিভাগে দর্শন হয় রেশমের পাতলা পর্দা— তার পিছনে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতির্পিণ্ড— প্রাণসূর্য বা শ্রীভগবান দর্শনের পথে শেষ আবরণ (অহং-এর আবরণ)।

এবার সপ্তমভূমি— শিরোমধ্যে মন উঠে আসে। প্রাণশক্তি সংকলিত হয়ে পরিবর্তিত হয় আত্মায়— আত্মাসাক্ষাৎকার হয়। ত্রিপুটি অবস্থায় এই দর্শন হয়। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা যেখানে এক হয়ে রয়েছেন। জ্ঞান— সচ্চিদানন্দগুরুর মূর্তি— ব্রহ্মপুরের সেই চিদ্‌ঘনকায় পুরুষ— জ্ঞানমূলং গুরোর্মূর্তিম্— গুরু প্রণামে যা আছে— এঁকেই উদ্দেশ্য করে। জ্ঞেয়— আত্মা। আর জ্ঞাতা তো দ্রষ্টা নিজেই। আত্মার মধ্যে থেকেই তিনি আত্মাকে দেখছেন। দেহের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে তন্মাত্র অবস্থায় রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— কেউ এসে বলবে, এই, এই—। এই কেউ হলেন সচ্চিদানন্দগুরু। চারিদিকে জ্যোৎস্নাসম স্নিগ্ধ জ্যোতির সমুদ্র। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সচ্চিদানন্দগুরু। তিনি বিচ্ছুরিত জ্যোতির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম নীল রেখার দ্বারা সীমায়িত অঙ্গুষ্ঠবৎ (বুড়ো আঙুলের আকৃতির) ঘন জ্যোতিকে তর্জনী সংকেত করে বলেন— এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন।

তারপর সেই ভগবানের মধ্যে লীন হন। তিনি যে শ্রীভগবানেরই এক রূপ তা এইবার স্পষ্ট হয় দ্রষ্টার কাছে।

পরে আত্মার অবস্থানের দিক পরিবর্তন ঘটে। বদনমণ্ডলের দিক হতে শিরোদেশের পশ্চাতে সরে গিয়ে প্রসারিত হয়। আত্মার এই প্রসারিত রূপ ধূমকেতুর লেজের মতো বা ধান্যশীর্ষবৎ— ধানের শীষ গোছা করে ধরলে যেমন দেখায়— অনেকটা ঝাঁটার মতোও বলা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাও মিলিয়ে যায়। দ্রষ্টার জৈবী সম্বিৎ ফিরে আসে।

এখানে বিজ্ঞানময় কোষের সমাপ্তি। বিশেষ রূপে জ্ঞান হয় নিজের স্বরূপের। আত্মাসাক্ষাৎকারের পর ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হতে থাকে ও শেষে দ্রষ্টার বোধ হয়— আমি দেহ নই, আমি আত্মা। এ একপ্রকার সমাধি। এই সময় থেকেই প্রকৃত সমাধি তথা ভগবানে পরিবর্তিত হওয়ার সূত্রপাত।

আত্মা-সাক্ষাৎকার হয় পূর্ণ যৌবন কালে, ২৪/২৫ বছর বয়সে। দেহটি হওয়া চাই অটুট ব্রহ্মচর্যপূর্ণ যোল আনা দেহ। যোলআনা দিলে তবে যোলআনা লাভ। দেহের একটি তন্তুও (Fibre) যদি কোনও ভাবে মলিন (Soiled) হয় বা ক্রিয়াশীল না হয় তাহলে পূর্ণভাবে আত্মা সংকলিত হবে না। কথায় বলে, কালো পাঁঠা একটুও খুঁত থাকলে মায়ের বলিতে লাগে না। বলি— জীবত্বের বলি— জীবত্ব থেকে শিবত্বে উত্তরণ।

আনন্দময় কোষ ঃ— সপ্তমভূমিতে ব্রহ্মানন্দে অবস্থান। শেষে সচ্চিদানন্দ অবস্থা লাভ হয়। সচ্চিদানন্দ অবস্থায় মহাবায়ু জাগরণ হয়ে সমাধি হয়— দুটি গাল ফুলে ওঠে। অপরেও তা দেখতে পায়।

বাবা, সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হল না— শ্রীরামকৃষ্ণ।

সচ্চিদানন্দ অবস্থা ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

ঘি কেমন? না, ঘি যেমন— শ্রীরামকৃষ্ণ।

বেদান্তের সাধন বা আত্মার সাধন

পরবর্তী ধাপের সাধনকে বেদান্তের সাধন বা আত্মার সাধন বলে। আত্মা-সাক্ষাৎকারের পর দীর্ঘ বারো বছর চার মাস ধরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট

কাটে।* ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট মানে টুকু টুকু অনুভূতি হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের স্পষ্ট ধারণা হওয়া। এই সময় কাল ও স্থান (Time and Space) নেই— এই অনুভূতি হয়।

কালের নাশ— অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ— এই তিন কালের নাশ হয়ে চিরন্তন বর্তমানের উপলব্ধি হয়। প্রথমত কাল কি হবে আজ দেখতে পাওয়া গেল। বারবার এই রকম ঘটে— এক বছর ধরে। দ্রষ্টার মনে হয় কাল ঘটবে! আমি আগের রাত্রে দেখেছি— তাহলে তো ঘটেছিল। ঘটবে আর কোথায়? হয়েই আছে, হবে আর কোথায়। ভবিষ্যৎ নয়, অতীত। ভবিষ্যৎ আর অতীতকে নিয়ে বর্তমান ফুটছে। ত্রিকাল এক হয়ে যাচ্ছে। এই হল কালের নাশ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনকে দেখালেন— শত্রুরা সব মরে রয়েছে অর্থাৎ যা হবার হয়েই আছে (Predestined)। এই অনুভূতি হলে দেহীর রজোগুণ সম্পূর্ণ নাশ হয়— তিনি বোঝেন তার করার কিছু নেই— তিনি দ্রষ্টা মাত্র, শ্রোতা মাত্র। তিনি তখন পরশুরাম অবতার— যিনি রজোগুণের প্রতীক ক্ষত্রিয়দের নাশ করেছিলেন। ঠাকুর এই অবস্থার কথায় বলেছেন— বিজ্ঞানীর এলানো ভাব।

স্থানের নাশ— গোটা কলকাতা শহরটা নিজের ভিতর দেখা গেল। তারপর সে অনুভূতি ভেঙে গেল। মনে হল এত বড় কলকাতা আমার মাথার ভিতর ধরলো কী করে? এই অন্তরের কলকাতা ও বাইরের কলকাতা কিন্তু এক— কোন সন্দেহ থাকে না। তখন ঠিক বুঝতে পারা যায় বাইরে যে কলকাতা দেখছি তা ভুল দেখছি। এ এত বড় নয়, আবার এত বড়ও বটে আবার ছোটও বটে। মাথার ভিতর ধরলো কী করে? এই সব ফুটের অনুভূতির শেষ হয়, নিঃসন্দেহ হয়, বিশ্বরূপ দর্শনে।

আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন হয়। এই ভিতরের জগৎ ও বাইরের জগৎ হুবহু এক (Identical)। যার দর্শন হয় তিনি বোঝেন বিশ্বসংসার তার ভিতরে। এই বোধোদয়ে তিনি অচঞ্চল হন, ধীর হয়ে যান। ঊর্ণনাভ

সাধনের এক একটি ধাপ শেষ হতে ১২ বছর ৪ মাস সময় লাগে। তাই ১২ বছর পর পর জগন্নাথের কলেবর বদলায়।

যেমন নিজের ভিতর থেকে জাল বের করে সেই জালেই বাস করে, সেই রকম মানুষ তার ভিতরের জগৎকে বাইরে বিক্ষেপ করে তার মধ্যেই বাস করছে। এই বিক্ষেপ চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে (continuous)।

আত্মার মধ্যে জগতের কথা বৃহদারণ্যকেও আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের দেহ-মধ্যে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণ অর্থাৎ আত্মা। যশোদার কোলে কৃষ্ণ। কৃষ্ণের মুখের ভিতর তিনি দেখলেন জগৎ অর্থাৎ দেহের মধ্যে আত্মা— আত্মার মধ্যে জগৎ। কবীর বলেছেন— কামহীন সরল জীবনযাপন কর তাহলে আত্মার মধ্যে বিশ্বসংসার দেখতে পাবে (Lead pure and simple life and behold the whole of creation within your own self– Cultural Heritage of India, Sri Ramkrishna centenary volume)।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— 'ম' আর 'রা'। 'ম' মানে ঈশ্বর 'রা' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর বা আত্মা দর্শন, তারপর তার ভিতর জগৎ দর্শন হলে উপলব্ধি হয় আত্মাই বিশ্বজগৎ হয়েছেন। সুতরাং চোখের সামনে যা কিছু দেখছি সবই ঈশ্বর। বহু নয়— এক-ই (রাম) আছেন।

এ কথাই রূপকে বোঝানোর জন্য বলা হল— দস্যু রত্নাকর 'মরা, মরা' জপতে জপতে রাম নাম উচ্চারণ করতে পারল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বিজ্ঞানীর অবস্থা শুরু হ'ল। এখন দেহভেদ করে যোগের লক্ষণসমূহ (পাঁচ প্রকার গতিতে কুণ্ডলিনী জাগরণ, মহাবায়ু জাগরণ, সমাধি ইত্যাদি।) প্রকাশ পেতে শুরু করে, বাইরে থেকে অপর লোকেও তা দেখতে পান।

এখানেই শেষ নয়। অপরকে শ্রীভগবান স্বপ্নে দেখান, ঐ দেহী একটি গ্লোব মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছেন— গোস্বামী।

এত বড় বিশ্বসংসার আমার ভিতরে! একটা খুঁতখুঁত ভাব আসে ...। জগৎ বীজে পরিণত হয়। বিশ্ব বীজবৎ অনুভূতি হয়। দেখা যায় হাতের উপর একটি বীজ— বোধ হয় এটিই জগৎ। উপলব্ধি হয় ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বিরাট মহীরূহ যেমন বিধৃত থাকে তেমনি জগৎ আমার ভিতর রয়েছে বীজ রূপে, অণুরূপে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে।

ঠাকুরের কথায়— গিন্নীদের ন্যাতাকাতার হাঁড়িতে, নীল বড়ি, সমুদ্রের

ফেনা, শশাবীচি সব থাকে— সৃষ্টিনাশের সময় মা সমস্ত বীজ কুড়িয়ে রেখে দেন। সে এই বিশ্ববীজবৎ অনুভূতির কথা।

এক রাত্রে পথের উপর মহাপ্রভুর বিরাট দেহ ও অপর এক রাত্রে তাঁর হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে গিয়ে কুষ্মাণ্ডবৎ দেহাবয়ব দর্শন করেছিলেন কয়েকজন ভক্ত। এ আসলে মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ দর্শন ও বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি লাভের বাহ্য প্রমাণ।

পরে বীজও থাকে না। স্বপ্নবৎ হয়ে যায়। ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা ক্রমাগত আগেই স্বপ্নে দেখতে দেখতে দ্রষ্টার কাছে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থা একাকার হয়ে যায়। জগৎ তার কাছে স্বপ্নবৎ বোধ হয়। তবে তা কিছুদিনের জন্য, অনুভূতির একটি পর্যায় মাত্র।

পরের অনুভূতি— স্বপ্নও নেই— নির্গুণে লয়। প্রথম ধাপ— জড় সমাধি। জড় সমাধিতে প্রাণশক্তি ইউক্লিডের জ্যামিতিক বিন্দুতে (Mathematical point) পরিণত হয়। ঐ বিন্দুর বাইরে তখন কোন বোধ থাকে না।

এই হ'ল পিতৃবীজে অর্থাৎ আদি প্রাণকণায় ফিরে যাওয়া।

দ্বিতীয় ধাপ— স্থিত সমাধি— বোধাতীত অবস্থা। এই হল মহাকারণে তথা নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হওয়া— বুদ্ধের শূন্যম্— মহানির্বাণ লাভ।* এখানেই সগুণ সাধনার পরিসমাপ্তি। একমাত্র রাজযোগে এই স্থিত সমাধি বা নির্বিকল্প সমাধি হয়। (Samadhi in Rajayoga is complete ... SERPENT POWER by Justice Woodrof) এখানে বোধ নেই, আমি নেই। তাই কী আছে মুখে বলা যায় না। কে বলবে? আমার অস্তিত্বই নেই— সুতরাং আমার জন্মমৃত্যুর প্রশ্ন ওঠে না— জীবন মৃত্যুর রহস্য ভেদ হয়।

স্থিত সমাধিতে দেহ টুটে যায়। কিন্তু শ্রীভগবান যে দেহে অবতীর্ণ হবেন সেই দেহ তিনি রেখে দেন। সেই দেহে তিনি নিজের রস নিজে আস্বাদন করেছেন এবং করবেন।

সংক্ষেপে বেদান্তের অনুভূতির স্তর পাঁচটি হল— (১) আত্মা সাক্ষাৎকার (২) আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন (৩) বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি (৪) জগৎ স্বপ্নবৎ (৫) কী আছে মুখে বলা যায় না— বোধাতীত।

**দেহবোধ লোপ পাওয়ায় এখানেই কামনার আগুন সম্পূর্ণ রূপে নির্বাপিত হয়।*

এই বেদান্ত সাধনে যিনি সিদ্ধ হয়েছেন তাকে পরমহংস বলে। কেননা ইনি দেহের সার আত্মাকে জেনেছেন— জলটি ছেড়ে দুধটি খেয়েছেন।

তত্ত্বজ্ঞান

নির্গুণে লয় হবার পর আবার যখন দেহীর জৈবী চেতনা ফিরে আসে তখনই হয় তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ। সাধন আরম্ভ হ'ল, আমি এই দেহ— এই থেকে। সমাপ্ত হ'ল— কিছুই নেই— শূন্য— তাও বলবার জো নেই। আমি নেই, বোধ নেই, কিছু নেই ...। এরপর যখন চেতনা ফিরে আসে তার রূপ হল— আমি না। তবে কে? হে ভগবান, তুমি, তুমি, তুমি। এই হল শ্রীরামকৃষ্ণের তুঁহু, তুঁহু। এই ভূমিতে অবস্থান করাকে বলে তত্ত্বজ্ঞান। এই সময় তত্ত্বফল আহরণের অনুভূতি হয়। দেখতে পাওয়া যায়, দেহী তড়াং করে নিজে গাছে ওঠেন। গাছটি অপরূপ। সে রকম গাছ কোথাও দেখা যায় না। ফলটিও অপরূপ। ফলটি অনেকটা নাসপাতির মত তবে একটু লম্বা। গাছ থেকে ছিঁড়ে হাতে ধরা রইল। সাধারণ জ্ঞান ফিরে এল। তত্ত্বফল লাভের তাৎপর্য এই যে আগমের সাধনের দর্শনগুলির ফল (effect) লাভ ও তার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে এবার।

এই তত্ত্বজ্ঞানই ক্রমশ অবতারত্বে পরিণত হয়। একে বলে নিগম বা পৌরাণিক নিগম।

অবতারতত্ত্ব

চৈতন্য সাক্ষাৎকার হয়।

সহস্রারের মধ্যে দপ্ করে লাল আলো জ্বলে ওঠে।

'অন্ধকারে লাল চীনে দেশলায়ের আলোর মত'— শ্রীরামকৃষ্ণ।

মস্তকের পশ্চাদ্ দেশে চৈতন্যের শিখা দর্শন না হলে এর প্রতীকিকরণ করে অনেকে চৈতন বা টিকী রাখেন।

এবার জ্যোতিরূপে এই চৈতন্যের অবতরণ ঘটে। জ্যোতির রূপ অবর্ণনীয়, তুলনারহিত।

প্রথম অবতরণ— সহস্রার থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত। এই অবস্থায় সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত চেতনা থাকে, দেহের বাকী অংশে চেতনা থাকে না।

একে চেতন সমাধি বলে। কণ্ঠদেশে চৈতন্যের অবতরণ ঘটলে কণ্ঠে ভাষা আসে, অপরকে ভাগবৎ কথা শোনানোর অধিকারী হয়।

ঠাকুর বলেছেন— শুক ও নারদের চেতন সমাধি। তাই এরা লোকশিক্ষা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের পর লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখে দিয়েছিলেন।

চৈতন্যের দ্বিতীয় অবতরণ— সহস্রার থেকে কটিদেশ (কোমর, মূলাধার) পর্যন্ত। এই হল প্রকৃত ঈশ্বরকটিত্বের উপলব্ধি। যার হয় তিনি ঈশ্বরকটি মানুষ। অপর পক্ষে যার মন বিষয় চিন্তা ছেড়ে আদপেই ঊর্ধ্বমুখী হয়নি, নিম্নভূমি অর্থাৎ কটিদেশে আবদ্ধ— তিনি জীবকটি মানুষ।

চৈতন্যের অবতরণের কথা বোঝাতে রাম ও কৃষ্ণের পিছনে থাকে হলুদ বা নীল রঙের দোলাই।

তারপর দেহের মধ্যেই ছোট্ট দেহী মানুষরতন (Manikin form of God) দর্শন হয়। তিনি পরমভক্ত। কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা— সারা কপাল জুড়ে— বর বিয়ে করতে যাবার সময় যেমন ফোঁটা পরে। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করেন। সেই সঙ্গে দ্রষ্টার হাতের তালু কির্‌কির্‌ করে ওঠে। মানুষরতন দর্শন না হলে প্রকৃত ভক্তি লাভ হয় না। মানুষরতন দর্শন ও তাঁকে দেহমধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ান যিনি তিনিই অবতার। তাঁর মধ্যেই চৈতন্য ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এরপর নিত্যলীলা যোগ। তখন মুহুর্মুহু সহজিয়া সমাধি— নিত্যানন্দ অবস্থা লাভ।

সংক্ষেপে, চৈতন্য সাক্ষাৎকার, চৈতন্যের অবতরণ ও মানুষরতন দর্শনকে অবতারতত্ত্বের সাধন বলে।

মানুষরতনকে দেহের মধ্যে পাবার পর অর্থাৎ অবতারত্বে অধিষ্ঠানের পর ভক্ত পঞ্চভাবের একটি ভাব আশ্রয় করে ভক্তিরস আস্বাদন করেন— সমস্ত দেহে ব্যাপ্তভাবে। পঞ্চভাব— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আগমে এদের পঞ্চভাব বলে। নিগমে এরা পঞ্চরস। তখন পূর্ণ আস্বাদন। নিগমের পঞ্চরস তলপেটে। তলপেটে কোটিপদ্ম— বলেছেন চণ্ডীদাস। এই পর্যায়ের সাধনকে রসের সাধন বা রসতত্ত্ব বলে।

এই সময় তলপেটে হরিরস দেখতে পাওয়া যায়। আগমের সাধনের সূচনায় এখানে জল দর্শন হয়েছিল— এখন ঘনীভূত রস।

পরে তলপেটে সিদ্ধি ঘোঁটার মত অনুভূতি হয়। বসে থাকা অবস্থায় দেহ দুলতে থাকে। এখন ব্যষ্টির সাধন যে শেষ হচ্ছে সেকথা বোঝাতে দ্রষ্টার নিজের কঙ্কাল দর্শন হয় (রামপ্রসাদের গানে আছে— অবশেষে রাখ গো মা হাড়ের মালা সিদ্ধি ঘোঁটা ...)। তারপর পেটে সন্তান নড়াচড়া করার মত স্পষ্ট অনুভূতি হয়। ঠাকুর বলতেন— ওরে, আমার পেটে কী একটা হয়েছে, ও যে লড়ে চড়ে।* শ্রীজীবনকৃষ্ণেরও তলপেটে কিছু একটা যেন ডানদিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরতে দেখা যেত। এর কিছুদিন পর তিনি দেখেন সন্তানবৎ পেটের ভিতরের ঐ বস্তু জ্যোতিরূপে দেহ থেকে বেরিয়ে জগতে ছড়িয়ে পড়ল। এখানেই ব্যষ্টির সাধনের শেষ ও সমষ্টির সাধনের শুরু। এবার মহাযোগের স্ফুরণে বিশ্বব্যাপীত্ব তথা ভগবানত্ব লাভ হবে।

রসতত্ত্বের সাধন শেষ হলে সাধকের অবতারত্ব ঘুচে যায় ও তিনি রসস্বরূপ ভগবান হয়ে যান, অতঃপর বিশ্বব্যাপিত্ব শুরু হয়। বিশ্বব্যাপিত্ব শুরু হওয়ার আগে অবতারত্ব অতিক্রমের স্পষ্ট অনুভূতি হয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখেছিলেন, উনি উদাসীনভাবে বসে আছেন। সামনে রাস্তা, সেখানে একটা ল্যাম্প পোষ্ট। তাঁর সামনে দিয়ে মলিন মুখে মাথা হেঁট করে কোন কথা না বলে ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন মানুষরতন।

বিশ্বব্যাপিত্ব বা ভগবানত্ব

এই পর্বে প্রথমে দৈববাণী হয়— 'এবার নীল চৈতন্য'। কখনও বা নীল চৈতন্য (নীলজ্যোতি) দর্শন হয়। নীল চৈতন্য মানে জগদ্ব্যাপী চৈতন্য তথা বিশ্বব্যাপিত্ব।

এরপর শ্রীভগবান স্বপ্নে মূর্ত হয়ে জানিয়ে দেন দ্রষ্টার ভগবানত্ব লাভের কথা। শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখলেন, অন্ধকার গুহা থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললেন একজন মানুষকে। মনে হল তার নাম অনাথবন্ধু। তিনি

এই অনুভূতির সাড়ে চার মাস পরই শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূল দেহের লীলা সংবরণ করেন।

হাতজোড় করে বললেন, বাবুজী, মশাই, আপনি জানবেন, আপনি ভগবান, তবে গুপ্তভাবে লীলা।

এবার ব্যক্তিচৈতন্য অবতীর্ণ হয় সমষ্টির মধ্যে। সংখ্যাতীত মানুষের অন্তরে তাঁর চিন্ময়রূপ ফুটে ওঠে আর তারা তাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলে তাঁর কাছে। তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে, জাগ্রতে, নিদ্রার আবেশে দেখবে হিন্দু, দেখবে মুসলমান, দেখবে খৃষ্টান অর্থাৎ সব সম্প্রদায়ের মানুষ। সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, শিশু-বৃদ্ধ, নর-নারী, সাধু-অসাধু ইত্যাদি কোন প্রকার গণ্ডি থাকবে না। তিনি বিশ্বমানব হয়ে উঠবেন। বেদে ভগবান দর্শনের এই অপূর্ব পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন রোগশয্যায়, গলায় ক্যান্সার, খেতে টেতে পারছেন না, নরেন্দ্রনাথ বললেন, মাকে বলুন যাতে কিছু খেতে পারেন। ঠাকুর মা কে বললেন, মা লরেন বলছে যাতে কিছু খেতে পারি। মা বললে, সে কী রে! তুই এত মুখে খাচ্ছিস একটা মুখে নাই বা খেলি! এটা বিশ্বব্যাপিত্বের দূরাগত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। আসলে জিনিসটা হল, ব্রহ্মত্বলাভকারী মানুষটির ব্রহ্মত্ব সংখ্যাতীত মানুষের অন্তরে রূপধারণ করে ফুটে উঠবে, তখন তার ক্রিয়া নেই, কামনা বাসনা নেই, নিজস্ব বলে কিছু থাকবে না, সে তখন আপনহারা। তার প্রতিটি ক্রিয়ায় সে দেখবে সে নয় অন্য কেউ তা করছে। অর্থাৎ সে তখন বিশ্বব্যাপী হয়ে রয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করে আত্মিক একত্ব উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় সত্যিকার ধর্মের, Universal Religion-এর। তাই স্বামীজি বলেছেন— Religion is Oneness।

দুর্গা রূপকল্পের দেহতত্ত্ব

হাজার হাজার বছর আগেই উপনিষদে বলা হয়েছে, যিনি প্রতীক পূজা করেন তিনি প্রতীকাপন্ন হয়ে পড়েন, তিনি মুক্ত হন না। তাই দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রতীক রহস্য ভেদ করে কল্পমূর্তি থেকে মনের উত্তরণ ঘটানো চাই পরম সত্যে। সাধক কবি চণ্ডীদাসের ভাষায়—

“মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখী তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনী, আঁধার পেরিয়ে আলা।”

তুলসী দাস এক দোঁহায় বলেছেন— সত্যিকারের বর এলে মেয়েদের পুতুল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। সেগুলো পেঁটরায় ভরে তুলে রাখে। এই বরের আগমন ধারাটি প্রতীকে দুর্গা পূজায় কিভাবে বিবৃত হয়েছে শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত যোগাঙ্গের সূত্র ধরে আমরা এখানে তা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথমে আসা যাক মহালয়ার কথায়—

মহালয়া হিন্দুদের ধর্মজীবনে বিশেষ একটি দিন। এটি পিতৃতর্পণের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ তিথি। ‘মহ’ শব্দের সঙ্গে আলয় শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ আলয়া যোগ করে হয় মহালয়া। ‘মহ’ কথার অর্থ পিতৃপুরুষের উৎসব। আর আলয়া মানে আশ্রয়। এখানে উৎসবের আশ্রয় একটি বিশেষ তিথি। অমাবস্যা তিথি। তিথি শব্দটি সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ। তাই আলয়-এর পরিবর্তে ‘আলয়া’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উৎসবের দিনে কেউ নিষ্ক্রিয় থাকে না, অচঞ্চল থাকে না। তাই ভাবা হয় পিতা তথা প্রাণের উৎস নির্গুণ ব্রহ্ম, যাকে আদিপুরুষও বলা হয়, তিনি সক্রিয় হন এই উৎসবের দিনে। নির্গুণ-ব্রহ্মে কম্পন জাগলে নাদ বা ধ্বনি সৃষ্টি হয়। শূন্যতত্ত্ব থেকে নাদতত্ত্ব, নাদতত্ত্ব থেকে রূপতত্ত্ব। চিন্ময় রূপ জেগে ওঠে। নির্গুণ থেকে সৃষ্টি হয় সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের কোন আকার নেই কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের রূপ আছে। কবীর বলেছেন, নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি, কারে নিন্দো কারে বন্দো দোনা

পাল্লা ভারী। অর্থাৎ নির্গুণ হ'ল বাবা আর সগুণ হ'ল মা। ঠাকুরও বলেছেন তোমরা যাকে ব্রহ্ম বল আমি তাকেই মা বলি। মায়ের কাছে জোর চলে। এই মা মানে সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মের লীলার পর্যায়কে বলা হয়েছে দেবী পক্ষ। মহালয়ার পরদিন থেকে শুরু হয় দেবী পক্ষ।

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার মহাঅজানা রহস্যময় নির্গুণব্রহ্মের প্রতীক। তাঁর কাছে প্রার্থনা আমার দেহস্থ প্রাণশক্তি (প্রতীকে জল) আত্মসাৎ করে তোমার চৈতন্যশক্তিতে রূপান্তরিত কর, তাই-ই আবার রূপধারণ করে আমার মধ্যে লীলায়িত হোক। আমি সেই চৈতন্যের রসাস্বাদন করতে চাই। সেই চৈতন্যের বিকাশের ধারাটি বৈদিক ধারায় হয়। কেননা বেদ সর্বজনীন মানবধর্মের কথা বলেছে। তাই সগুণব্রহ্মের লীলায় প্রথমে ব্রহ্মপুর (সহস্রার) থেকে অজানা মানুষের রূপে সচ্চিদানন্দগুরু নেমে আসেন। সপ্তভূমির সাধন করিয়ে দিয়ে সপ্তমভূমিতে আত্মা সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। তখন সব অভাব, চাহিদা মন থেকে দূরে যায়। মন বলে যা পেয়েছি তাতে জীবন পরিপূর্ণ। দুঃখ দূরকারিনী দুর্গাকে পেয়েছি অন্তরে। সপ্তমী তিথিতে তাই দুর্গাপূজা হয় প্রতীকে ঐ তত্ত্ব স্মরণ করাতে। এর আগে ষষ্ঠীর দিন বোধন। ষষ্ঠভূমি ভ্রূমধ্য মন এলে দেহীর অধ্যাত্মচেতনার উদ্‌বোধন ঘটে। নানান ঈশ্বরীয় রূপদর্শন হয়। ঈশ্বর যে আছেন সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষমূলে পূজা হয়। বেলপাতার ত্রিফলক ত্রিনয়ণের প্রতীক। ত্রিনয়ণের স্থান ভ্রূমধ্য, ষষ্ঠভূমি। এখানে ঈশ্বরীয় রূপ যা দেখা যায় তা কানার হাতী দেখার মত আংশিক দেখা। সপ্তম ভূমিতে গিয়ে আত্মার পূর্ণ দর্শন হয়— তাই সপ্তমীতে আসল পূজো শুরু হয়।

অষ্টমী তিথি বেদান্ত সাধন পর্যায়ের কথা। বেদান্তের সাধন শেষে মহাকারণে লয়— দেহবোধের সম্পূর্ণ লয়— (অহং জ্ঞানের) বলি হয়। আর নবমী হ'ল নিগমের অনুভূতির পর্যায়। তত্ত্বজ্ঞানে বেঁচে থাকা ও শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ইত্যাদি পঞ্চভাবে ঈশ্বরের লীলারস আস্বাদন করা। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে সন্ধিপূজা হ'ল মরজগতের সঙ্গে অমর জগতের সন্ধির কথা। মরণশীল দেহ নিয়ে অমৃত আস্বাদনের, জীবন্মুক্তি আস্বাদনের দুর্লভ সুযোগ ঘটে যদি বেদান্ত সাধনের পরও দেহটি থেকে যায়। অবশেষে দশমীতে বিজয়া— সকলের সঙ্গে মিলন। সাধকের দেবত্ব নিজের দেহসীমা ছেড়ে নিজেরই চিন্ময়রূপে

অন্যের অন্তরে ফুটে উঠে তাদের সাথে আত্মিক একত্ব অনুভব করে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। মানবজীবন সার্থক হয়।

এবার চোখ ফেরানো যাক দুর্গা রূপকল্পের বিস্তৃত ব্যাখ্যায়। পুরাণ কাহিনী অনুসারে দেবতাদের হারিয়ে মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য জয় করে নিল। এর প্রতিকার বিধানে সকল দেবতার তেজপুঞ্জ সমন্বয়ে সৃষ্টি হলেন দেবী দুর্গা, জগন্মাতা। তারই হস্তে নিহত হলেন সসৈন্য মহিষাসুর।

মহিষাসুর— দেহাত্মবুদ্ধি— আমি এই দেহ— এই বোধ। দেহাত্মবোধ দেহীকে দেহসুখে (ইন্দ্রিয়সুখে) প্ররোচিত করে যা কি'না পশুদের (মহিষ) ধর্ম বলে বিবেচিত হয়। এতে মন নিম্নমুখী হয়— দেহী নীচমনা হন।

দেবতা— মন ঊর্ধ্বমুখী হলে দেবত্ব বা আত্মিকশক্তি জাগে। মস্তিষ্কে সৎ প্রবৃত্তি (Good cells of brain) জন্ম নেয়। দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হয়। অবশ্য এর ক্রম আছে— এক আনা, দু'আনা, চার আনা ইত্যাদি। এই আংশিক নিঃসৃত আত্মাকে ইষ্টমূর্তিরূপে (সংস্কারজ দেবদেবী মূর্তিতে) দেখা যায়। মন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ষষ্ঠভূমিতে (ভ্রূ-মধ্যে) এলে এক বা একাধিক ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। কিন্তু এইসব দর্শনে দেবভাব জাগলেও দেহবুদ্ধির বিলোপ সাধন হয় না। সব দেবতার সমন্বয়ে সৃষ্ট হলেন দুর্গা— দেহ থেকে ষোলআনা আত্মা নিঃসৃত হয়ে সপ্তমভূমি সহস্রারে (শিরোদেশে) সংকলিত ও রূপান্তরিত হয়ে বিচ্ছুরিত জ্যোতিসমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘনজ্যোতিরূপে আত্মা দেখা দিলেন। সাধক বুঝলেন ঈশ্বর বহু নন, এক। এতকাল তারই কারণশরীর নানা দেবদেবীর রূপ ধরে দেখা দিচ্ছিল। এরপর ব্রহ্মজ্ঞানের নানাবিধ ফুট কেটে দেহীর উপলব্ধি হয়, আমি দেহ নই, আমি আত্মা— শাশ্বত এক সত্তা। তখন দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পায়— মহিষাসুর বধ হয়।

অবশ্য মহিষাসুর মাতৃপদস্পর্শ লাভে শরণাগত বা ভক্তরূপে অমর হয়ে গেল— কারণ দেবশক্তি জেগে উঠলে পশুশক্তি পদদলিত হয় কিন্তু জীবত্ব বা অহং, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'বজ্জাৎ আমি', ষোলআনা নাশ হয় না। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, "অশ্বত্থ গাছের ডাল আজ কেটে দাও দু'দিন পর দেখ আবার ফেঁকড়ি গজিয়েছে।" তাই মহিষাসুর অমর। ঠাকুর তাই বললেন, আমি যদি যাবে না তো থাক শালা "দাস আমি" হয়ে।

তবে যার বস্তুতত্ত্বে ষোলআনা আত্মাসাক্ষাৎকার হয় (প্রতীকে নয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মনের স্থায়ী পরিবর্তন হয়ে) তার ক্ষেত্রে অন্যরকম ঘটে। তাই ঠাকুর বললেন, কারও কারও ক্ষেত্রে তিনি "আমি" একেবারে মুছে ফেলেন। মাইরি বলছি আমার আমি খুঁজতে যাই কিন্তু খুঁজে পাই না। যদিও এরূপ ব্যক্তি কোটিতে গুটিক— একযুগে মাত্র একজন।

মানুষের দুঃখের কারণ হ'ল তার অভাব। সেই অভাব মেটে ঈশ্বরকে অন্তরে পেলে, ঈশ্বরত্ব লাভ হলে। তাই সকল দুঃখ দুরকারিণী তিনি— তিনি দুর্গা।

তিনি সাধকের কল্পনায় ফোটা কোন দেবীমূর্তি নন। রূপদর্শন— সাধকের কারণশরীরের লীলাদর্শন মাত্র। বস্তুত দুর্গা হলেন আত্মার প্রতীক। আত্মার তো লিঙ্গভেদ নেই। ইনি নারী পুরুষের ঊর্ধ্বে এক শাশ্বত সত্তা। তাই নারীমূর্তি গড়েও তাকে পৈতে পরানো হয়। এঁকে জগন্মাতা বলা হয়েছে— কারণ পরে আত্মার মধ্যে বিশ্বজগৎ তথা বিশ্বরূপ দর্শন হয়। উপলব্ধি হয় ইনিই জগদ্ধাত্রী, জগৎ প্রসবিতা।

তিনি দশভুজা— জীবনের দশদিকেই যে তাঁর কল্যাণ হস্ত প্রসারিত আত্মজ্ঞানী পুরুষ তা উপলব্ধি করতে পারেন। আপাত দৃষ্টিতে যা দুঃখ বিপদ বলে বোধ হয় তাও বিপদতারণের মহিমা প্রকাশের ধারা ও ভক্তকে বেশী করে কাছে টেনে নেবার কৌশল হিসাবে বিবেচিত হয়।

সিংহবাহিনীর সিংহ বলবিক্রমের প্রতীক। দেহে প্রচণ্ড আত্মিক তেজ না জাগলে এই আত্মা সাক্ষাৎকার দেহ সহ্য (বহন) করতে পারে না। ব্রেন ক্র্যাক (crack) করে বা দেহ টুটে যায়।

একদিন পঞ্চবটী যাবার পথে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখলেন— একজন ভক্ত মাটিতে শুয়ে কাঁপছেন আর মুখে 'কা' - 'কা' শব্দ করছেন। ঠাকুর ওনার বুকে পা দিয়ে ডলে দিয়ে বললেন, চুপ কর শালা, শালা মা-কে (কালীকে) দেখেছে, তাই অমন করছে।" ছোট আধার, আত্মিক শক্তি কম— তাই বড় দর্শন দেহ সহ্য করতে পারছে না।

দুর্গাকে পেলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকেও লাভ করা যায়। এরা দুর্গার সন্তান। সন্তান মানে সম্যক তান— একই ধারা অর্থাৎ তারই পরিবর্তিত অবস্থা তথা আত্মার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপ।

লক্ষ্মী— ঐশ্বর্যের দেবী। ঈশ্বরীয় অনুভূতিই হ'ল ঐশ্বর্য। লক্ষ্মী বলতে আত্মা সাক্ষাৎকার ও আত্মার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শনে প্রাপ্ত আত্মিক অবস্থাকে বোঝায়। সপ্তম ভূমিতে মন উঠলে আত্মাসাক্ষাৎকার হয়। জ্যোৎস্নাসম স্নিগ্ধ পরমজ্যোতির সমুদ্রে নীল রেখা দ্বারা সীমায়িত অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘন জ্যোতিকে দেখিয়ে সচ্চিদানন্দগুরু বলেন, এই ভগবান এই ভগবান দর্শন। তারপর তিনি আত্মায় বিলীন হন। শেষে এই আত্মাকে ধান্যশীর্ষবৎ (এক গোছা ধানের শীষের মত) আকৃতিতে দর্শন হয়। দর্শন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। পরে আত্মার মধ্যেই সমগ্র জগৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন হয়। এই হল ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান দর্শন। তখন উপলব্ধি হয় যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে। সাধক লক্ষ্মী ছেলে অর্থাৎ শান্ত হন, অচঞ্চল হন।

লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা— পেঁচা হল নিশাচর পাখি। লোকচক্ষুর অন্তরালে যার ক্রিয়া চলে। বিশ্বরূপ দর্শন হওয়া পর্যন্ত সাধকের যৌগেশ্বর্য দেহভেদ করে বাইরে পরিস্ফুট হয় না। দেহেতে যোগের ক্রিয়া (আত্মিক বিবর্তন বা আত্মাপাখি পেঁচার ক্রিয়া) চলে গুপ্তভাবে।

সরস্বতী— বিদ্যার দেবী তথা জাগ্রত ব্রহ্মবিদ্যা। বিদ্যা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। তাই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতীক হল শ্বেতাম্বরা এক নারীমূর্তি। সাদা রঙের দ্বারা পবিত্রতা বোঝানো হয়। জ্ঞান পবিত্রতা দান করে। বেদান্ত সাধন সম্পূর্ণ হবার পর দেহে ব্রহ্মবিদ্যা জাগ্রত হয়ে ওঠে। দেহী বোঝেন ব্রহ্মবিদ্যা শুধুমাত্র চিন্তার বিষয় নয়, শ্রবণমাত্র মনন মাত্র তা শরীরে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মবিদ্যার কথায় দেহস্থ ভগবান দেহের ভিতর থেকে সাড়া দেন। দেহবীণায় ঝংকার তুলে বুঝিয়ে দেন দেহী যা শুনছেন তা সত্য। এখন যৌগৈশ্বর্য (পাঁচ রকমভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ, সমাধি, অর্ধবাহ্যদশা, সচ্চিদানন্দ অবস্থা ইত্যাদি) দেহ ভেদ করে বাইরেও প্রকাশ পেতে থাকে। সাধক তা চেপে রাখতে পারেন না। অপরেও তা দেখতে পায়।

সরস্বতীর বাহন হাঁস— কথায় আছে হাঁস জলে দুধে মেশানো থাকলে জলটি ছেড়ে দুধটি খেতে পারে। দেহের সার আত্মার সাক্ষাৎকার ও বেদান্তের সাধন শেষে "দেহ ও আত্মা পৃথক" এবং "আমি দেহ নই, আমি আত্মা"— এই উপলব্ধি হয়েছে যার তিনি পরমহংস। এই পরমহংসত্ব প্রাপ্ত মানুষ ব্রহ্মবিদ্যার ধারক ও বাহক।

কার্তিক— দেব সেনাপতি, যার আবির্ভাবে অসুরদের বিরুদ্ধে দেবতাদের

জয় স্থায়ী হয়েছিল। সুতরাং কার্তিক হ'ল সেই আত্মিক অবস্থা যখন দেহে স্থায়ীভাবে দেবশক্তির প্রাধান্য রক্ষা পায়। বেদান্ত সাধনের পর অবতারতত্ত্বের সাধন শুরু হয়। এই পর্যায়ের সাধনে চৈতন্য সাক্ষাৎকার ও সহস্রার থেকে কটিদেশে জ্যোতিরূপে তার অবতরণ হয়। পরে তা ছোট্ট দেহী বরবেশী মানুষরতনের রূপ ধরে সর্বদা হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে থাকে। এই মানুষরতন দর্শন হলে দ্রষ্টার পাকাভক্তি লাভ হয়। অবতারত্বে অধিষ্ঠান ঘটে। শিব চৈতন্যের (Divine Consciousness) বিশেষ পরিণতি এই মানুষরতন-ই কুমার কার্তিকেয়। তিনি কৌমার বৈরাগ্যবান ও অত্যন্ত সুপুরুষ অর্থাৎ ব্যষ্টির সাধনে ঊর্ধ্বরেতা সাধকের আন্তর সৌন্দর্যের (দেবত্বের) সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে এই অবস্থায়।

কার্তিকের বাহন ময়ূর— ময়ূরের পাখায় থাকে যোনি চিহ্ন। এর তাৎপর্য হল অবতারের দেহের প্রতি লোমকূপ মহাযোনি হয়ে ওঠে ও তিনি দেহ-আত্মার রমণসুখ অনুভব করেন যা জৈবী রমণ সুখের কোটিগুণ বেশি আনন্দদায়ক। তাই তিনি সকল নারীতে মাতৃরূপ দর্শন করেন ও চিরকুমার থাকেন।

গণেশ— জনগণের ঈশ (দেবতা)— অবতারত্ব অতিক্রম করে যিনি জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপ ধরে ফুটে উঠে সর্বজনীন মানবে রূপান্তরিত হয়েছেন অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন। ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত মানুষই সিদ্ধিদাতা— ঈশ্বরত্ব দানের অধিকারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "তার অবতারকে দেখাও যা তাকে দেখাও তা।" ভগবানে পরিবর্তিত মানুষটির চিন্ময়রূপ অন্তরে দর্শন করে অসংখ্য মানুষ তার ঈশ্বরত্ব লাভ করে— সিদ্ধিলাভ করে।

গণেশের মাথা হাতির মাথা— হাতি মনের প্রতীক। মন যেন মত্ত করী, পাগলা হাতির ন্যায় অস্থির কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী। ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত মানুষের মন থাকে শুধু উচ্চভূমিতে— পঞ্চমভূমি কণ্ঠ থেকে সপ্তমভূমি শিরোদেশে। এদের মন কখনও পঞ্চমভূমির নীচে নামে না।

গণেশের বাহন ইঁদুর— ইঁদুর সচ্চিদানন্দগুরুর প্রতীক। উপনিষদে বলা হয়েছে ইঁদুর যেমন ধানের খোসাটি নষ্ট না করে ভিতরের সারবস্তু চালটি

নিখুঁতভাবে বের করতে পারে সেইরূপ দেহের বিনাশ না ঘটিয়ে দেহ থেকে আত্মাকে নিঃসৃত করে সচ্চিদানন্দগুরু দেহীকে তা দেখিয়ে দেন।

"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। সচ্চিদানন্দই গুরু।" শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টার মশাইকে (শ্রীম-কে) বলেছিলেন, "স্বপ্নে যদি আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে দ্যাখ, জানবে সে আমি নই, সে সচ্চিদানন্দ।"

জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে সচ্চিদানন্দগুরু হিসাবে ফুটে ওঠার মাধ্যমেই তাঁর ভগবানত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই গণেশ অধিষ্ঠিত থাকেন ইঁদুরের উপর।

কার্তিক ছোট ও গণেশ বড় ছেলে— অর্থাৎ গণেশ বলতে যে আত্মিক অবস্থার কথা বোঝায় তা পরবর্তী অবস্থা হলেও উচ্চতম অবস্থা— আত্মিক স্ফুরণের চূড়ান্ত অবস্থা। তাই সর্বপ্রথম গণেশের পুজো হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আগে ফল তারপর ফুল। আগে ঈশ্বরত্বের পরিচয় লাভ পরে তার কারণ অনুসন্ধান তথা সাধনের রহস্যভেদ।

দুর্গা যুগপৎ এক আবার বহু। দুর্গার ন'টি রূপ একত্রে নবদুর্গা বা কলাবৌ। একজন মানুষ ব্রহ্ম হন আর তার ব্রহ্মত্ব পরিব্যাপ্ত হয় মনুষ্যজাতির মধ্যে। তারা তাঁর চিন্ময় রূপ দেহের ভিতর দর্শন করেন। বেদমতে তা হ'ল আত্মার-ই রূপ— এষ আত্মেতি (ছান্দোগ্য ৮/৩/৪)। সংখ্যাতীত মানুষের দেহে পরিস্ফুট এই আত্মার রূপকে একত্রে বলা যায় নবদুর্গা। এক বহু হয়ে নিজের রস নিজে আস্বাদন করেন। তাই নবদুর্গার প্রতীক রসাস্বাদনীয় ন'টি উদ্ভিদ। বহু বোঝাতে এখানে নয় সংখ্যাটি নেওয়া হয়েছে নবগ্রহের বৈশিষ্টের সাথে এর সম্বন্ধ ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। সূর্যকে ঘিরে নবগ্রহের আবর্তনের ন্যায় এই সকল দ্রষ্টাদের জীবন তাঁকে (অন্তরে দৃষ্ট মানবব্রহ্মকে) অবলম্বন করে পরিচালিত হয়।

সমস্ত প্রতীকগুলির দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুধ্যানে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হ'ল—ব্রহ্মত্ব মানুষের অন্তর্নিহিত— স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা প্রকাশ পায়। তখন ধরার মানুষই ব্রহ্ম হয়। তার ব্রহ্মত্ব জগৎব্যাপী হয়। তাঁকে অন্তরে দর্শন করে মানুষ সত্য তথা পরম এককে উপলব্ধি করে। নতুন তাৎপর্যে ধ্বনিত হয়, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

কালীতত্ত্ব

“কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।” তাই শাস্ত্র ছেড়ে যাঁরা কালীকে অন্তর মধ্যে দর্শন করে কালীর রহস্য ভেদ করেছেন তাদের উপলব্ধি থেকে সংক্ষেপে কালীতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করা যাক্।

কালীকে বিভিন্ন সাধক নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত কালী— আদ্যাশক্তি— এই দেহ। দেহ ছাড়া আত্মার পূর্ণ প্রকাশ আর কোথাও হয় না— তাই দেহই আদিশক্তি। দেহের দুই বিপরীত অবস্থার, শান্ত ও রুদ্র অবস্থার কথা প্রতীকে কালীরূপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই দেহ থেকেই শুভচেতনার উদ্ভব হয় আবার এই দেহ থেকেই অশুভশক্তির প্রকাশ হয়। কালীর বামহস্তে খড়্গ ও মুণ্ড ধ্বংসের প্রতীক, দেহের রুদ্র রূপ। অপরদিকে ডান দিকের দুটি হাতে বর ও অভয়মুদ্রা কল্যাণময়ী শক্তির প্রতীক, দেহের শান্ত রূপ। তাই প্রার্থনা মন্ত্রে আছে— “রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্ পাহি নিত্যম্।” অর্থাৎ হে রুদ্র তোমার প্রসন্ন মূর্তির দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। দেহ প্রসন্ন হলে দেহের শক্তির সার অন্তর্মুখী হয়ে মূলাধার থেকে সহস্রার অভিমুখে গতিলাভ করে তখন তাকে বলা হয় কুণ্ডলিনী শক্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইনিই কালী। তাই একটা গানে আছে— জাগ, জাগ জননী, মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হ’ল কুলকুণ্ডলিনী, স্বকার্যসাধনে চল মা শিরোমধ্যে, পরমশিব যথা সহস্রদল পদ্মে।...

সহস্রারে প্রবেশের আগে ষষ্ঠভূমিতে সাধকের ঈপ্সিতরূপ ধারণ করে এই কুণ্ডলিনী শক্তি— একে ইষ্টমূর্তি বলে। যার ইষ্ট কালী তিনি ষষ্ঠভূমিতে কালীরূপ দেখতে পান। এরপর কুণ্ডলিনী সপ্তমভূমি বা সহস্রারে গমন করলে তা পরমজ্যোতির সমুদ্ররূপে আত্মায় পরিবর্তিত হয়। আত্মা-ভগবান-ব্রহ্ম তিনই এক। তখন সাধকের উপলব্ধি হয়— আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে বলছেন, তোমরা যাকে ব্রহ্ম বল, আমি তাকেই কালী বলি। সংক্ষেপে কালী হ’ল এই দেহ— পরে কুণ্ডলিনী— তারপরে— ইষ্টমূর্তি— তারপরে আত্মা ও শেষে পরমাত্মা।

একদিন কেশব সেন ঠাকুরকে বললেন, আপনি যে পাঁচরকম কালীর

কথা বলেন, সেটা একবার বলুন। ঠাকুর কালীর অর্থাৎ প্রাণের পাঁচটি দশার কথা নিজস্ব ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন। বললেন, তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী আবার শ্মশানকালী।

যখন সৃষ্টি হয় নাই, নিবিড় আঁধার তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর কোমল ভাব— বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তারই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়— রক্ষাকালীর পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শবশিবা ডাকিনী যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ।...

মহাযোগী শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত কালীর উপরোক্ত বর্ণনার যৌগিক রূপ বা মর্মার্থ নিম্নরূপ —

১। মহাকালী— নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসমুদ্র— পিতার সহস্রারে আপাত নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম। তখনও আমার জন্ম হয়নি।

২। নিত্যকালী— নির্গুণব্রহ্মরূপ সমুদ্রে ঢেউ বা স্পন্দন তথা নাদ জাগে। এই নাদ থেকে চিন্ময় (জ্যোর্তির্ময়) রূপ সৃষ্টি হয়— জ্যোতিস্বরূপ প্রাণ জেগে ওঠে। ভাষান্তরে চৈতন্যের সাগর থেকে উত্থিত হয় অনুচৈতন্য বা পিতৃবীজ। তখনও তা অনিত্য দেহ ধারণ করেনি, তাই তাকে বলে নিত্যকালী।

৩। রক্ষাকালী— পিতার সহস্রারে নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে জেগে ওঠা সেই চৈতন্যকণা বা প্রাণকণা বা পিতৃবীজ তথা নিত্যকালী একটি অনিত্য রক্তমাংসের কোষ অবলম্বন করে মাতৃগর্ভে পরিস্ফুরিত (develop) হতে শুরু করে। এই সময় তাকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়। ভূমিষ্ঠ হবার পরও চলে সেই প্রক্রিয়া, যতদিন না স্থূল দেহ ও দেহস্থ চৈতন্য স্থিতিশীল অবস্থা লাভ করছে! শ্যামাকালী অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে।

৪। শ্যামাকালী— ২৫ বছর বয়সে পূর্ণ যৌবনদশায় দেহের গঠন সম্পূর্ণ হয়। ১২/১৩ বছর বয়সে সচ্চিদানন্দগুরু লাভে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে দেহে যে চৈতন্যের বিকাশ শুরু হয় যোগের প্রতিকূল

পরিবেশ থেকে সযত্নে তাকে রক্ষা করতে হয়— অবশেষে তা স্থিতিশীল (Permanent) হয়, ২৫ বছর বয়সে আত্মাসাক্ষাৎকার হলে। তখন থেকে দেহী শ্যামাকালী— বরাভয়দায়িনী।

এই দশা চলে প্রায় ষাট বছর বয়স পর্যন্ত। দেহীর আত্মা সাক্ষাৎকার হওয়ায়, স্বরূপ জ্ঞান হওয়ায় তার বাইরে ছোটাছুটি করণ প্রকরণ বন্ধ হয়, শান্ত হয়ে যায়। ভিতরে আত্মার সাধন চলতে থাকে। আত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়। অবশেষে তার প্রকাশ ঘটে অন্য বহু মানুষের অন্তরে।

৫। **শ্মশানকালী**—এবার দেহ জরাগ্রস্ত হয়— ক্ষয় পেতে থাকে। ব্যাধির আক্রমণ হয়। ধীরে ধীরে শ্মশানের পথে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে, লয়ের দিকে, অগ্রসর হয়। অপরপক্ষে ব্যষ্টি চৈতন্য লয় পেতে থাকে সমষ্টি চৈতন্যের মধ্যে। দেহীর আত্মা দেহের গণ্ডী ছেড়ে সেই দেহেরই চিন্ময় রূপে জাতিবর্ণধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে উঠতে থাকে। তাদের জীবত্বনাশ হতে থাকে। তারা তাঁকে কেন্দ্র করে একসূত্রে গ্রথিত হয়। যেন তারই গলায় শোভিত নৃমুণ্ডমালা রচনা করে। তাদের অবলম্বন হ'ন তিনি— তাই এই শ্মশানকালীর কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। ক্রমে আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের অন্তরে তিনি ফুটে উঠতে থাকেন। ধীরে ধীরে সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানব হয়ে ওঠেন তিনি। এইভাবে তিনি মহাকালের বুকে পা রাখেন। মরণশীল দেহ অবলম্বন করেই অমরত্ব লাভ করেন। এক অর্থে বিধির বিধান অগ্রাহ্য করেন। নিজের এই শক্তি প্রদর্শনে নিজেই যেন লজ্জা পান। তাই বলা হয় কালী লজ্জায় জিভ কাটেন।* এই অবস্থায় শ্মশানকালী

**একজন স্বপ্নে দেখেছেন মাখনের এক পাহাড়। কাছে গিয়ে দেখেন ওটা পাহাড় নয়, বিশালদেহী জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। উনি শুনে বললেন, মাখনের পাহাড় রূপে দেখলি! মাখন— আত্মা। তাহলে বোঝ! বলেই নিজেকে প্রকাশ করে ফেলায় লজ্জায় জিভ কাটলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সুধাংশুবাবু দেখলেন, জীবনকৃষ্ণের মুখটা জিভ বের করা কালীর মুখ।...*

রূপান্তরিত হন মহাকালীতে। তবে এই মহাকালী আর নিষ্ক্রিয় নন, তিনি ক্রিয়াশীল।

মহাকালী, নিত্যকালী, রক্ষাকালী অবস্থা সবার জীবনেই দেখা যায়। শ্যামাকালী অবস্থা প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। কেননা বৈদিক যুগের ঋষিদের পর এযুগে প্রথম তারই দেহে আত্মা সাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্ত (reference) পাওয়া যায়। শ্মশানকালী অবস্থারও সূচনা হয়েছিল তার দেহে। জীবদ্দশায় অল্প কয়েকজন তার চিন্ময়রূপ অন্তরে দর্শন করেছিল। তবে শ্মশানকালীর পূর্ণাঙ্গ রূপ সর্বজনীন মানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে পরিস্ফুট হওয়ায় তাঁর দেহস্থ চৈতন্যই জগতে প্রথম মহাকালী অবস্থা লাভ করেছে। বেদমতে এরূপ পুরুষের চিন্ময় রূপই আত্মার রূপ— "অস্মাৎ শরীরাৎ ... এষ আত্মেতি।" তাই তিনি অসংখ্য সাধারণ মানুষের দেহে চিন্ময়রূপে ফুটে উঠে তাদের শ্যামাকালী অবস্থা প্রাপ্তিকে সম্ভব করে তুলছেন।

কালী কে? না, যিনি কালকে কলন করেন। কলন মানে গ্রাস বা খণ্ড করা। এই দেহ মহাকালকে খণ্ড করছে। আমরা বলি লোকটি ৮০ বছর বাঁচল কি ৭০ বছর বাঁচল ইত্যাদি। যিনি রক্তমাংসের দেহ নিয়েই চৈতন্যের রূপান্তরে মহাকালী অবস্থা লাভ করতে পারেন তিনি করালবদনী হয়ে অখণ্ড কালকে গ্রাস করেন অর্থাৎ শাশ্বত হয়ে যান। চিন্ময় রূপ ধরে চিরকাল তার লীলা চলতে থাকে। এই মহাকালী ঘটে ঘটে বিরাজ করেন— বহু মানুষের দেহঘটের ভিতর তার চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে। তারা কালী হয়ে ওঠে। তাদের ভিতরের অসুর প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়।

পুরাণে বলছে, কালী কালো কেন? না, শুম্ভ নিশুম্ভ কর্তৃক দেবতাদের নিগৃহীত হবার কথা শুনে দেবী অম্বিকা ক্রোধান্বিতা হলেন। তার দেহ-কোষ থেকে কৌষিকী বা কালী নির্গত হলেন— ক্রোধে কালো বর্ণ ধারণ করেছিলেন বলে তিনি কালী। অর্থাৎ আত্মার আংশিক স্ফুরণে স্থূল দেহ থেকে কারণশরীর উদ্ভূত হয়ে ইষ্টমূর্তি ধারণ করল। কারণশরীরের লীলাদর্শনে দেবত্ব জাগলেও ষোলআনা দেবত্ব প্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না, রহস্য (কালো) থেকেই যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কালী কালো কেন জান? দূরে তাই কালো।

সমুদ্র দূর থেকে নীলবর্ণ, কাছে গেলে কোন রং নাই। অর্থাৎ নির্গুণ। বেদে যাকে ব্রহ্ম বলে আমি তাকেই কালী বলি।

নরেন একদিন বলল, তিনদিন ধরে এত ধ্যান করলাম কিন্তু কালীরূপ দর্শন হ'ল না। ঠাকুর নির্বিকারভাবে বললেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। অখন্ড সচ্চিদানন্দই কালী। অর্থাৎ কালীরূপ দর্শন হ'ল না বলে আক্ষেপ করার কিছু নেই। সাধক অবস্থায় একসময় মায়ের দেখা পাচ্ছেন না বলে ঠাকুর ছটফট করছেন— মাটিতে মুখ ঘসড়াচ্ছেন আর বলছেন, মা রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি আর আমায় দেখা দিবি না? শেষে একদিন মায়ের হাতের খড়্গ নিয়ে নিজের গলায় কোপ দিতে গেলে সহসা দর্শন হ'ল— স্নিগ্ধজ্যোতির বড় বড় ঢেউ এসে তাকে ডুবিয়ে দিল। পরমশান্তি! তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সম্বিৎ ফেরার পর থেকে একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। কালীরূপ দেখার জন্য আর কেউ তাকে ছট্‌ফট্‌ করতে দেখে নি। তিনি বুঝলেন, "মা কি আমার কালো রে, কালোরূপে দিগম্বরী হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে!"

কালী ন্যাংটাবেশে শত্রু নাশে— কেননা কালী বা আত্মা দেহের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে দেখা দেন— তখন অহংরূপ শত্রু নাশ হয়— জ্ঞান হয়, আমিই কালী। তাই ভক্ত প্রার্থনা করেন, মা তুমি নিরাবরনা হয়ে দেখা দাও। তোমায় দেখে মায়ামুক্ত হই, স্বরূপ প্রাপ্ত হই।

আবার যখন বলা হয়, কালীই মহামায়া— তখন দেহের কথা বোঝায়। প্রত্যেকের দেহের রূপ আলাদা, তাই মনুষ্যজাতির বহু রূপ। এই বহুরূপতা-ই মহামায়া। সত্য কি? একং সৎ। দেহের আবরণ ভেদ করে সবার মধ্যে এককে (এক আত্মাকে) উপলব্ধি করাই মায়ামুক্ত হওয়া— কালীর প্রসন্নতা লাভ। বহু মানুষের আত্মিক দর্শন অনুভূতির কথা শুনে এই উপলব্ধি হয়। বহু দেহের এই প্রসন্নতা লাভই মহামায়ার কৃপা।

রামপ্রসাদের গানে আছে— "আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতো।" কালী প্রথমত দেহ— পরে কুন্ডলিনী— ইষ্ট— আত্মা— নাদ— নির্গুণ— পরমাত্মা। যিনি আত্মা সাক্ষাৎকার করে দেহ আত্মার মিলনে (রমনে) ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন তিনিই আত্মারাম। আত্মা দর্শন একবারই হয়। তাহলে পরবর্তীকালে আত্মার সাথে পুনঃপুনঃ মিলন কিভাবে হবে? আত্মা কালী

অর্থাৎ একটি রূপে, নাদের (প্রণব) আকারে, নাদপ্রমাণ হয়ে (in the size of Nada) মিলিত হ'ন। ব্রহ্মের কথা শোনামাত্র দেহীর দেহে ব্রহ্মানন্দ জাগে। অবশ্য তার পূর্বে, বেদান্তের সাধন শেষে স্থিতসমাধি লাভের ঠিক আগে নাদের অনুভূতি হয়ে, নাদের রহস্য ভেদ হওয়া চাই। দেহী তখন বোঝেন তার অস্তিত্বের (আত্মার) এক রূপ হ'ল নাদ।

আবার এর পরবর্তীধাপে কালী অর্থাৎ স্থূলদেহ নিয়ে সাধক আত্মা বা ব্রহ্মে পরিবর্তিত হন। এই হ'ল আত্মারামের আত্মা কালী। এর প্রমাণ (proof) নাদের মত। নাদ থেকে যেমন চিন্ময় রূপ জেগে ওঠে তেমনি এই দেহধারী ব্রহ্মের মুখের কথা শুনলে শ্রোতাদের অন্তরে তাঁর কথা ও তাঁর রূপ ফুটে ওঠে। তাই কদমতলায় শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে আগত অসংখ্য মানুষ তাঁর শ্রীমুখের বাণী শুনে অজস্র দর্শন অনুভূতি লাভ করতেন।

এখন তাঁর স্থূলদেহ না থাকলেও তিনি নাদে পরিবর্তিত হয়ে আছেন, নামী তার নামে (শব্দে) পরিবর্তিত হয়ে আছেন। তাই মানুষ তার নামগান করলে স্বপ্নে কখনও বা স্থূলে তার চিন্ময়রূপ দর্শন করেন। বেদে একেই বলেছে— "সম্পদ্য আবির্ভাব স্বেন শব্দাৎ"। আর তাঁর শ্রীমুখের বাণী যা তিনি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা পাঠ ও শ্রবণে তাঁর নাদে পরিবর্তিত সত্তাকে লাভ করা যায়— তাঁর চিন্ময় রূপ ও তাঁর বিবৃত ব্রহ্মবিদ্যা অনুভূতি হয়ে ফোটে ভিতরে।

গানে আছে, "কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে।" 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে গঠিত সংস্কৃত বর্ণমালা যেন কালীর গলায় নৃমুণ্ড মালা। কেননা কালী— আদ্যাশক্তি প্রসন্ন হলে, দেহ যোগযুক্ত হলে তবে যোগের ঠিক ঠিক ভাষা মুখে যোগায়। তাই ঠাকুর বলতেন, মা আমার কথার রাশ ঠেলে দেন।

স্বরবর্ণের যোগাঙ্গ

আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির মূলে প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের দর্শন চিন্তার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে মননিষ্ঠ পর্যালোচনার ভার ঐতিহাসিকদের। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি অনেকের কাছে কৌতুহলোদ্দীপক মনে হতে পারে। এখানে বাংলা স্বরবর্ণের যোগাঙ্গ নিয়ে একটু বিচার করা যাক।

আদি বর্ণ 'অ'— আদিপুরুষের প্রকাশের দ্যোতক— তিনি অজ— তার জন্ম নেই— মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না— অনাদি অনন্ত— তাঁকে যিনি গ্রাস করেন তথা একীভূত হয়ে হৃদয়ঙ্গম করেন তিনি অজগর— ভগবান ধরার কল এই মনুষ্যদেহের মূলাধার হতে সর্পিল গতিতে ঊর্ধ্বপানে ধাবমান কুণ্ডলিনী শক্তি। তাই অজ্ঞাতসারে আমরা বলছি—

অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে। শ্রীভগবানের কৃপায় কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে ঊর্ধ্বগতি লাভ করা চাই। যদিও এ জিনিস হয় 'কোটিতে গুটিক' অর্থাৎ একযুগে একজনের। পরেই বলা হয়েছে—

আ-য়ে আমটি খাব পেড়ে। তখন আম অর্থাৎ অমৃতফল লাভের তথা অমৃত হওয়ার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জাগে অন্তরে। অন্তর প্রকৃতি মৈত্রেয়ীর মতো বলে ওঠে— 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহম্ কিম্ কুর্যাম'— যা দ্বারা আমি অমৃতা হব না তা নিয়ে আমি কি করব?

ই-তে ইঁদুরছানা ভয়ে মরে। ইঁদুর অর্থাৎ জীবত্ব লোপ পাবার উপক্রম হয়।

ঈ-তে ঈগলপাখী পাছে ধরে। পাখী আত্মার প্রতীক। ডিমের মধ্যে পাখীর অস্তিত্বের পরিচয়টি স্পষ্ট নয়। পরে ডিম ফুটে ছানা বেরোলে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে।' দেহ যেন ব্রহ্মাণ্ডের (ব্রহ্মের অণ্ডের) ক্ষুদ্র সংস্করণ। দেহস্থ আত্মার পূর্ণ পরিচয় মেলে সহস্রারে মন উঠে এসে যখন আত্মাসাক্ষাৎকার হয় তখন। এই আত্মারূপ পাখীর দর্শন লাভ হলে পুরোপুরি জীবত্ব (animality) নাশ হয়। পরে তিনিই ঈশ্বরত্বলাভ করে সর্বজনীন হয়ে অন্যের অন্তরে প্রকাশ পেয়ে তাদের জীবত্ব নাশ করেন।

উ-তে উট চলেছে মুখটি তুলে। কুৎসিৎ দর্শন উট হল বদ্ধজীবের উপমা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— উট কাঁটা ঘাস খায়। মুখ দিয়ে দরদর করে

রক্ত পড়ে তবু কাঁটা ঘাসই খাবে। সেইরূপ জগতের মানুষ যারা সংসারে ভোগের মধ্যে রয়েছে তারা ঈশ্বরকে না জেনে নিজেকে কর্তা ভেবে তাদের আচরণে অহংকার (কদর্যরূপ) প্রকাশ করে চলেছে।

ঊ-টি আছে ঝুলে। পরবর্তী ধাপে দৈবী মানুষের সান্নিধ্যে লাভে কারও কারও অন্তরে সংশয়ের দোলা জাগে— মনে প্রশ্ন জাগে সংসার কি আমার ইচ্ছায় চলে নাকি অন্তরাল থেকে অন্য কোন শক্তির ইঙ্গিতে চলছে? ঈশ্বরের অনুধ্যান ব্যতিরেকে সংসার কি কখনও কাউকে যথার্থ শান্তি দান করতে পারে? অন্ধকার জীবনে আলোর হাতছানি দেখা যায়।

ঋ-তে ঋষিমশাই বসেন পূজায়। শান্তি দেবার একমাত্র মালিক ঈশ্বরের দিকে মন ধাবিত হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডল চিরন্তন আত্মজিজ্ঞাসার প্রতীক। এক অর্থে জিজ্ঞাসুচিত্ত ব্যক্তিই সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি। এরূপ ব্যক্তি প্রথমে প্রচলিত ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের পরিচয় পেতে আগ্রহী হয়।

ঌ-কার যেন ডিগবাজী খায়। আত্মাসাক্ষাৎকার হয়েছে যে যুগপুরুষের তাঁর চিন্ময় রূপ ধরে, ভিতরের ভগবান সাড়া দিলে ধীরে ধীরে বিধিবাদীয় ধর্মকর্ম উঠে যায়। 'ঠিক জ্ঞান হলে নরলীলায় মনটি আসে।' তখন হৃদয়ে অনুভূত হয় একজন রক্তমাংসে গড়া মানুষই ঈশ্বর হন, তাঁকে অন্তরে দর্শন করলে ঈশ্বর দর্শন হয়। ''তার অবতারকে দেখাও যা তাকে দেখাও তা''— শ্রীরামকৃষ্ণ।

এ-তে এক্কা গাড়ী খুব ছুটেছে। দেহরথে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির রূপ উদ্ভাসনে মানুষ সত্যের পথে, অদ্বৈত জ্ঞানের পথে এগিয়ে চলে।

ঐ-তে ঐ দেখ ভাই চাঁদ উঠেছে। দ্রষ্টা উপলব্ধি করেন ঐ মানবদেবতা যিনি তাকে ভিতর থেকে পরিচালিত করছেন তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের ভিতর আছেন (সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ)— তিনি সর্বজনীন মানব— 'চাঁদামামা সকলকার মামা।'

ও-তে ওল খেও না ধরবে গলা। তখন তিনি ঈশ্বরীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা বলে বা শুনে আনন্দ পান না বরং কষ্ট পান। 'অন্যাং বাচো বিমুঞ্চথঃ'— গীতা।

ঔ-তে ঔষধ খেতে মিছে বলা। 'ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা'— এই জ্ঞান যার হয়েছে তিনি আর অহংরূপ ভবরোগের নিরাময়ের লক্ষ্যে বাহ্যিক কোন করণ প্রকরণের মধ্য দিয়ে যান না। তিনি জানেন ভবরোগের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য বৈদ্যনাথ তারই ভিতরে। আপনা হতে তার প্রকাশ ও ক্রিয়া হয়— স্বয়ম্ভু।।

দোল ও হোলির পার্থক্য

কথায় বলে, বাঙালীর দোল দুর্গোৎসব। দোল বাঙালীর নিজস্ব উৎসব। সর্বভারতীয় হোলি উৎসব মহাপ্রভুর আমলে বিশিষ্ট রূপ পায়— সূচনা হয় দোল উৎসবের। মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিধর্মে রাগানুগা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হ'ল। যে ভক্তিতে রাগ বা প্রেমই একমাত্র শরণ্য, পুঁথিপত্রের বিধান তুচ্ছ, তাকেই রাগানুগা ভক্তি বলে। এর যোগজ লক্ষণ হ'ল, প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বমুখী হয় ও সাথে সাথে রক্ত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে প্রতি লোমকূপের গোঁড়া লাল ঘামাচির মত হয়। দেখে মনে হয় দেহটা যেন একটা রক্তের চাঁই অথবা সারা দেহে যেন বেশ করে লাল আবীর মাখানো হয়েছে। পুরীতে মহাপ্রভুর এই অবস্থা ভক্তেরা প্রত্যক্ষ করেছিল। হোলির আগের দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের রং খেলা স্মরণে দোলগোবিন্দের বিগ্রহের পায়ে আবীর উৎসর্গ করে কৃষ্ণকীর্তনে মত্ত হতেন। তাঁর দেহে অদৃষ্টপূর্ব অপার্থিব মহাভাব দর্শনে বিমোহিত ভক্তকুল কৃষ্ণ অনুরাগের রঙের প্রতীক ঐ আবীর জীবন্ত জগন্নাথ জ্ঞানে তাঁর পাদস্পর্শ করিয়ে নিজেরা পরস্পরকে মাখাতেন আনন্দ করে। ঐ দিনটি মহাপ্রভুর জন্মদিনও বটে। তাই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভক্তরা ঐ দিনটিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কৃষ্ণ অনুরাগের রঙে রঞ্জিত হবার জন্য মেতে উঠত নাম সংকীর্তন ও আবীর খেলায়। বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তারের সাথে সাথে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আবীর খেলা সমগ্র বাংলাদেশে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সমাদর লাভ করে। পরের দিনের হোলি উৎসব গুরুত্ব হারায়।

এক মতে দোলের দিন রাধা ও কৃষ্ণ দুজনে একসাথে দোলনায় দুলে ছিলেন ও পরস্পরকে আবীর রঙে রঙীন করে তুলেছিলেন। রাধাতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া অন্যেরা গ্রহণ করেনি। তাই বাংলা ও বৃন্দাবনের* বাইরে ভারতের অবশিষ্ট অংশে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কৃষ্ণের মেঢ্রাসুর দৈত্যকে বধ করে বিজয়োৎসবে রক্তের হোলি খেলার পুরাণ কাহিনী স্মরণ করে কৃষ্ণের পূজা হয় ও পরদিন সর্বসাধারণ হোলি খেলায় মত্ত হয়।** মেঢ্র

মহারাষ্ট্রের নাসিক ও অন্যান্য কিছু অঞ্চলে পঞ্চমদোল হয়— হোলি হয় না।

***তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে হোলি উৎসবের সূচনা হয়।*

শব্দের অর্থ শিশ্ন বা লিঙ্গ। অর্থাৎ কৃষ্ণ কামরূপ অসুরকে জয় করেছিলেন। তাই তিনি ভক্তদের আসক্তি মুক্ত করতে পারেন। হোলি আসলে মদনের দর্পচূর্ণের দিন।

অনেক স্থানে মূর্তি গড়ে বিষয়টিকে রূপদান করা হয় (যেমন বীরভূমের নাকড়াকোন্দা গ্রামে)। যৌবনের প্রতীক বসন্তে রঙের উৎসব হোলির মর্মার্থ হল— আমরা নারীপুরুষ আজ রঙীন হয়ে উঠবো কিন্তু আসক্তি জন্মাবে না, মন নিম্নগামী হবে না। কেননা আমাদের সাথে আছেন কৃষ্ণ যিনি আজ মদনমোহন রূপে প্রকাশ হয়েছেন। নারীপুরুষের পারস্পরিক ভালবাসার দিন বা ভ্যালেণ্টাইন্‌স্ ডে-র ভাবনার বিপরীত ভাবনা। ভক্ত ভগবানের অপার্থিব প্রেমলীলা স্মরণে বিশুদ্ধ ভক্তির জাগরণে নারী পুরুষ নির্বিশেযে সকল মানুষকে ভালবাসার আবেদন আছে এই উৎসবে।

পৌরাণিক চরিত্র হোলিকাসুরের নাম থেকে হোলি নামটি এসেছে। স্কন্দ পুরাণে আছে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আদেশে তার ভগ্নী হোলিকাসুর প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করেছিল। আগুনে তার দেহ পুড়বে না এমন বরপ্রাপ্ত হোলিকা অক্ষত থাকবে অথচ প্রহ্লাদ মারা যাবে এই ছিল অভিপ্রায়। কিন্তু বিষ্ণুর ইচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশের সময় অগ্নিস্তব করতে ভুলে যায় হোলিকা। ফলে অগ্নি ক্রুদ্ধ হয় ও হোলিকা পুড়ে মারা যায়। কিন্তু প্রহ্লাদের কোন ক্ষতি হ'ল না বিষ্ণুর আশীর্বাদে। এই আগুন আসলে কামাগ্নির প্রতীক। বিষ্ণুর কৃপায় শুদ্ধাভক্তিতে কামাগ্নি নিভে যায়— ভক্ত এই রিপু থেকে মুক্ত হয়। দোলের পূর্বদিনে চাঁচড় পোড়ানো, ন্যাড়া বা বুড়ি পোড়ানো ও মেড়া (অর্থাৎ ভেড়া) পোড়ানোর প্রতীকি আচরণেও এই বক্তব্যই তুলে ধরা হয়েছে। উড়িষ্যায় হোলির আগের দিন জীবন্ত ভেড়ার গায়ে আগুন দেওয়া হয়— একে বলে মেন্‌টা পোড়াই। উত্তর প্রদেশে মথুরাতে আগুন জ্বালার পর তার মধ্যে দিয়ে একজন মানুষকে ছুটে পার হতে হয়। দক্ষিণ ভারতেও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আগুনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ভারতের মত, এর নাম 'কামদহনম্।'

শুধু কামকে জয় করা নয়, কামকে ঈশ্বর প্রেমে রূপান্তরের উপর জোর দিলেন মহাপ্রভু। প্রেম মূর্ত হল তাঁর দেহে। প্রেমের পর বস্তুলাভ।

ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। বস্তু অর্থাৎ আত্মা সাক্ষাৎকার করে দেহ আত্মা পৃথকের অনুভূতি লাভ হল শ্রীরামকৃষ্ণের। খোড়ো নারকেল বা শুকনো সুপারী নাড়ার মতো খট্‌খট্‌ শব্দ করে মাথা ডাইনে বাঁয়ে দুলে তাঁকে সমাধিতে বিলীন হতে প্রত্যক্ষ করেছেন বহু মানুষ। দেহ ও আত্মা পৃথক— একথা শোনামাত্র এরূপ অনুভূতিলাভই দোলের যোগজ লক্ষণ। এই-ই রাধাকৃষ্ণের দোলনায় দোলা।

পরবর্তীকালে যার বহু প্রদর্শন ঘটেছে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দিব্যতনুতে। ব্যষ্টিতে নয়, দোলের পূর্ণরূপটি সমষ্টিতেই পরিস্ফুট হয়। কেননা একা রং মেখে আনন্দ হয় না, সকলে কৃষ্ণ অনুরাগের রঙে রাঙা হোক তবে তো সর্বদা কৃষ্ণকথা বলবার মানুষ পাওয়া যাবে, ঈশ্বর প্রেম সজীব থাকবে সতত। আধ্যাত্মিকের দৃষ্টিতে দোলের এই চূড়ান্ত পর্যায়টি জগতে বিকশিত হল শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। তাঁর দেহে রাগানুগা প্রেমের লক্ষণ ফুটল, তারপর দেহ আত্মা পৃথকের অনুভূতি জাগল, শেষে তিনি অসংখ্য মানুষের অন্তরে স্বপ্নে ফুটে উঠে তাদের ঈশ্বর প্রেমে আপ্লুত করতে লাগলেন। তারা আবার পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের আত্মিক দর্শনের কথা শুনিয়ে তাঁর প্রেমের রঙে রঙীন হয়ে উঠছেন। মহাপ্রভুতে জন্ম নেওয়া বিশিষ্ট বাঙালী কৃষ্টি এই দোল পূর্ণতার পথে পা রেখেছে— হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। আমরা হোলিকে অতিক্রম করে উপভোগ করছি দোলকে তার পরিপূর্ণ রূপটি সহ। এই দোল আজ আর একটি বিশেষ তিথিতে আবদ্ধ নয়— চলছে সম্বৎসরকাল ধরে।

রথযাত্রার আদি-অন্ত

পণ্ডিতদের মতে জগন্নাথের রথের সূচনা হয়েছিল বৌদ্ধদের রথযাত্রা থেকে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের লেখা ফো-কো-কি অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের দেশের বিবরণ-এ বৌদ্ধদের রথযাত্রার প্রত্যক্ষ বিবরণ আছে। গবেষকদের মতে বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার প্রচলন হওয়ার পরই বুদ্ধদেবের রথযাত্রা শুরু হয়। সময়টা সম্ভবত প্রথম শতাব্দী। শক রাজা কণিষ্কের গান্ধার রাজসভায় বৌদ্ধধর্ম দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। পৌত্তলিকরা পরিচিত হল মহাযান রূপে। মূর্তিপূজার বিরোধী হীনযানরা সংখ্যালঘু হয়ে গেল। কোন দেব বা দেবীকে যানে আরোহী করে যানের রশি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার মহাযানী বৌদ্ধরীতিটি জনপ্রিয় হ'ল এবং পরে তা গৃহীত হ'ল হিন্দুধর্মে। নাম হল রথযাত্রা। পুরীতে রথযাত্রা সবথেকে বড় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই রথযাত্রা সংস্কৃতিতে উপজাতি সংস্কৃতি এবং হিন্দুধর্মের শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও সনাতন ধারার সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।*

বলা হয় বুদ্ধের নির্বান লাভের পর তার দেহ থেকে চার বর্ণের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছিল অর্থাৎ তিনি বিশ্বজনীন হলেন, কেননা পৃথিবীতে চার রকম গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট মানুষ দেখা যায় (লাল, কালো, সাদা ও হলুদ)। এই বিশ্বমানবের ত্রিকায় (Trinity) কল্পনা করা হ'ল। ধর্মকায় (জগতের সার সত্তা, যেমন বেদের নির্গুণ ব্রহ্ম), সম্ভোগকায় (জ্যোতির্ময় দেহধারী বুদ্ধ) ও নির্মাণকায় (মর্ত্যলোকবাসীদের উপদেশ দেবার জন্য মর্ত্যদেহধারী বুদ্ধ)। এরা আবার ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ— এই তিন শরণের প্রতীকের সাথে মিশে গেল। পরে শংকরাচার্যের আমলে জগন্নাথ মন্দির হিন্দু মন্দির হ'লে** পুরাণের দৃষ্টিতে 'বুদ্ধং শরণং

**মন্দিরের ভিতর বিমলাদেবী ও পাতালেশ্বর শিবের পূজা হয় যথাক্রমে শাক্ত ও শৈব রীতি মেনেই। এমনকি পাঁঠা বলিও হয়। নবকলেবরের সময় বনজ কর্ম হয় উপজাতি ধারায়। স্নানযাত্রার মন্ত্র বৈদিক হলেও আচার শবর রীতি মেনেই হয়। দেবার্চনা ও ক্রিয়াকর্ম বৈদিক ও অনার্য ধারায় হয়।*

***বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। এর বাইরের গাত্রে অশ্লীল সব মূর্তি লক্ষ্য করা যায় যা অনেকের মনে নানা প্রশ্ন জাগায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন— মন যখন বহির্মুখী তখন অশ্লীলতা, মন অন্তর্মুখী হলে পবিত্রতম ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হয়।*

গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' এই শরণ মন্ত্রের বুদ্ধ হলেন বলরাম, ধর্ম হলেন কৃষ্ণ আর সংঘের প্রতীক হলেন সুভদ্রা। বৌদ্ধভাবনার সাথে হিন্দু পুরাণ কাহিনীর সামঞ্জস্য বিধান ঘটানো হ'ল। এই প্রসঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের একটি স্বপ্ন স্মরণ করা যেতে পারে। একবার তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করার কথা ভাবছেন, সেই সময় এক স্বপ্নে দেখলেন, করুণার প্রতিমূর্তি অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ, জ্ঞানের প্রতীক মঞ্জুশ্রী আর ভাবীকালের মৈত্রেয় বুদ্ধ তিনজনে হাজির তার শিয়রে। বললেন, সুদূর চীনদেশ থেকে এক শ্রমণ আসবে তোমার কাছে শিক্ষালাভ করতে। তাকে শিক্ষা দেওয়ার পর তোমার ছুটি। কয়েকবছর পর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হিউয়েন সাং এলেন তার কাছে। যাইহোক শীলভদ্রের ঐ স্বপ্নে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ, মঞ্জুশ্রী ও মৈত্রেয় বুদ্ধ পুরীর বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের কথা মনে পড়ায়।

শংকরাচার্য বৌদ্ধদের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিকদের তর্কে হারিয়ে তাদের সনাতন ধর্মে আস্থা ফেরালেন। আর বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্গের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্মানিত বোধ করল তাদের রথযাত্রার সংস্কৃতিকে হিন্দুরা গ্রহণ করায়। এতে সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হ'ল। ধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক পুরীর জগন্নাথ ও তার রথযাত্রার সংস্কৃতিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি এর কেন্দ্রীয় ভাবনাকে অন্তরে গ্রহণ করে তা বাংলাদেশে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন আচণ্ডালে কোল দেবার মাধ্যমে। সেই শুভ প্রচেষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'— এর সংস্কৃতির হাত ধরে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে অবশেষে শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে নতুন এক রূপ নিল। আত্মিক একত্বের বাস্তব সূচনা হল এই বাংলাদেশে।

প্রথমে আমরা প্রাসঙ্গিক পুরাণ কাহিনীটি জেনে নিই। কৃষ্ণের লীলা সম্বরণের সময় উপস্থিত হয়েছে। নির্জন একটি গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে তিনি বসেছিলেন। এমন সময় জরা নামে এক ব্যাধ তাঁর চরণ দু'খানিকে পাখি মনে করে তীর ছুঁড়লে তিনি তীরবিদ্ধ হন। ব্যাধ কাছে এসে সব দেখে কেঁদে কৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কৃষ্ণ বললেন, আমার ইচ্ছাতেই সব হয়েছে। তুমি দুঃখ কোরো না। তুমি বর নাও। ব্যাধ বলল, তবে বর দাও যেন পরজন্মে তোমাকে পাই আর সারাজীবন ধরে সেবা করতে পারি।

উনি বললেন, তথাস্তু। তারপর দেহ রাখলেন। বলরাম আগেই ধ্যানযোগে দেহ রেখেছিলেন। সুভদ্রাও দুই দাদার মৃত্যুর পর বাঁচতে চাইলেন না। অর্জুন তিনজনের সৎকার করলেন ঐ ব্যাধের সহযোগিতায়।

চিতায় বলরাম, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার দেহ পোড়ানো হল বটে কিন্তু নাভিস্থলগুলি অক্ষত রইল। আধপোড়া কাঠের সঙ্গে নাভিস্থলগুলি জড়িয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হল।

সেই কাঠ ভাসতে ভাসতে এল পুরীর সমুদ্রে। এদিকে জরা ব্যাধ এখন নবকলেবরে হয়েছেন বিশ্বাবসু। বেঁটে খাঁটো, তামাটে রংয়ের শীর্ণকায় দেহ। মাথার চুলগুলি সাদা। জাতিতে শবর। নারদ কর্তৃক নীলমাধব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। স্বপ্ন নির্দেশে সমুদ্রতীরে এসে দারুব্রহ্ম (শবরদের বৃক্ষদেবতা কিটুং) পেলেন। বিশ্বকর্মা তৈরী করে দিলেন মূর্তি। সেই বিগ্রহ নিয়ে একান্তে সেবা পূজা করেন একাশ্রয়ী বনে। সেখানে তিনি একা।

কালক্রমে বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্ন নির্দেশে পুরীর মন্দির তৈরী করেন। পুরোহিত বিদ্যাপতির সাহায্যে গভীর জঙ্গলে মন্দিরের সন্ধান করে বিশ্বাবসুর কাছ থেকে নীলমাধবের মূর্তি চুরি করে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেননা এর আগেই নীলমাধব বিশ্বাবসুকে বলেন, এবার আমার সময় হয়েছে, লোকসমাজে প্রকাশ হব। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজা নেব। বিশ্বাবসু বললেন, তুমি তো শুধু আমার থাকবে কথা দিয়েছিলে। নীলমাধব বললেন, বেশ তবে আমি নব কলেবরে (জগন্নাথরূপে) সেখানে গিয়ে পূজিত হব। আমার এই মূর্তি লুপ্ত হবে। তাই মূর্তি আনতে গিয়ে রাজা দেখেন সে মূর্তি নেই। শোকে ভেঙে পড়লেন। স্বপ্ন হল, চিন্তা নেই। সমুদ্রতীরে তিনটি দারু ভেসে আসবে। অক্ষয় বটের নীচে রাখলে তা থেকে পাতা বেরোবে। সেই কাঠ থেকে বিশ্বকর্মা বিগ্রহ তৈরী করে দেবেন। ঠিক তাই ঘটল। বিশ্বকর্মাও রাজী হলেন মূর্তি তৈরী করতে।

রাণী গুণ্ডিচার বাড়িতে তৈরী হতে লাগল সে মূর্তি। বিশ্বকর্মা বললেন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সে ঘরের দরজা না খোলে। তাহলে তিনি আর কাজ করবেন না। অসহিষ্ণু রাজা বিশ্বকর্মার কথামত অপেক্ষা না করেই কয়েকদিন পর দরজা খুলে দেখতে গেলেন কেমন হয়েছে তার

উপাস্যের মূর্তি। অমনি কাজ অসমাপ্ত রেখে বিশ্বকর্মা চলে গেলেন। রাজা শোকে ভেঙে পড়লেন, তখন স্বপ্নাদেশ পেলেন শোভাযাত্রা সহকারে জগন্নাথের ঐ অসম্পূর্ণ মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করতে হবে মূল মন্দিরে। এই ঘটনাকে স্মরণ করে প্রতি বছর প্রতিষ্ঠা দিবসে গুণ্ডিচা থেকে মূল মন্দিরে জগন্নাথকে নিয়ে যাওয়া হয় শোভাযাত্রা সহকারে, সেটি হল উল্টোরথ। তাই আগের সপ্তাহেই তাকে আনা হয় গুণ্ডিচায়। তাকে বলে সোজা রথ।

এবার আসা যাক পুরাণ কাহিনীটির যোগাঙ্গে। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন মানুষ পেতে চেয়েছে নিজের শাশ্বত সত্তা আত্মার (আত্মাপাখীর) পরিচয় তথা পরমাত্মা স্বরূপ পুরুষোত্তমকে। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় বহু যুগ। ব্রহ্ম সমুদ্র থেকে চৈতন্যের ঢেউ আপনা থেকে ধরা দেবে বিশেষ একটি দেহবৃক্ষে। দৈব কৃপায় আপনা হতে সাধন হবে (পাতা বেরোবে) সেই দেহে। স্বপ্ন দর্শনে ধরিয়ে দেবে তার আত্মিক বিকাশের রহস্য। একাশ্রয়ী বনে সাধন অর্থাৎ ব্যষ্টির সাধন শেষে বিশ্বাবসুর (বিশ্ব জুড়ে বাস করেন যিনি) মধ্যে আবদ্ধ বিশ্বজনীন সত্তার পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে। ব্রহ্মত্বলাভ করেন। ইন্দ্র মানে ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে এই বার্তা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একবার বলরাম বসু জগন্নাথ দর্শন করে ফিরে এলে ঠাকুর তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমাকে স্পর্শ করায় জগন্নাথকেই স্পর্শ করা হ'ল। অর্থাৎ বলতে চাইছেন ভগবান দর্শনকারী ব্যক্তি ভগবান হয়ে যান।

বিশ্বাবসুই ইন্দ্রদ্যুম্ন হয়ে অর্থাৎ পরম ব্রহ্মত্ব লাভ করে নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন একাধারে কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রা হয়ে অর্থাৎ নির্গুণের শক্তির ক্রিয়ায় (কৃষ্ণ) চিন্ময় (শ্বেতকায় বলরাম) দেহ (সুভদ্রা) নিয়ে অসংখ্য মানুষের অন্তরে প্রকাশ পান। যত বেশি মানুষ তাঁর রজ্জুরূপ মহাকুণ্ডলিনীতে* যুক্ত হয়ে আত্মিকে তাঁতে পরিবর্তিত হয় ততই তাঁর রথ চলতে থাকে— একজন জীবন্ত মানুষই যে দেহবান ব্রহ্ম তথা সচল জগন্নাথ তা জানতে পারে জগদ্‌বাসী।

**জগন্নাথের রথের রশির নাম শঙ্খচূড় ও বলভদ্রের বাসুকী। এই নাগ কুণ্ডলিনীর প্রতীক।*

এক রথযাত্রার দিনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র অলৌকিক এক দর্শন লাভে চমকিত হলেন। তিনি দেখলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু একই সাথে রথের অগ্রভাগে হরিনামরত সাতটি কীর্তনের দলেই নৃত্য করছেন। তিনি উপলব্ধি করলেন ইনিই প্রকৃত জগন্নাথ— যিনি যুগপৎ এক এবং বহু। "একো'হম বহুস্যাম"— এর আভাস ফুটেছে এখানে।

মানুষের ঈশ্বরত্বলাভের পরবর্তীধাপ বহু মানুষের মধ্যে তার প্রকাশ— সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হওয়া। এর আভাস ফুটল পরবর্তীযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। ইনি কখনও জগন্নাথধাম যাননি। রথের দিন বলরামবসুর বাড়ির ভিতর ছোট্ট রথের দড়ি ধরে টান দিয়েছেন। এই রথ রাস্তায় বেরোত না, থাকত বাড়ীর মধ্যেই দোতলায়। ব্যক্তিগতভাবে কিছু মানুষ অন্তরে তাঁর চিন্ময় রূপ দেখে বুঝল এনার মধ্যে জগন্নাথের প্রকাশ। তাই বলরাম বসু পুরীতে তাদের জগন্নাথের সেবা থাকলেও রথের সময় বা নিজেদের সেবাপালার সময়ও পুরী যেতেন না। দাদাকে চিঠিতে লিখলেন, আমি এখানে সচল জগন্নাথকে পেয়েছি, তুমি দেখে যাও। দাদা শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এসে এই সত্য স্বীকারও করেছেন। মাহেশের রথে গোপাল মায়ের ভুতে ভুতে গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণ) দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্নাথস্বরূপের পরিচয়ের অন্যমাত্রা ফুটে উঠেছিল।

রামকৃষ্ণ ভাবধারার উত্তরসূরী শ্রীজীবনকৃষ্ণ পুরীতে প্রায় এক বছর ছিলেন। একদা শ্রীরামকৃষ্ণকে আদর্শ করেই যে জগন্নাথ মন্দিরের আট্‌কে প্রসাদ না খেয়ে তিনি অন্নগ্রহণ করতেন না, পুরীতে এসে সেই মন্দিরে এক দিনের জন্যও প্রবেশ করেননি। প্রসাদও খাননি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অবশ্য এর উত্তর আছে। শেষ জীবনে কাশীপুর বাগানে তিনি একদিন বললেন, "কালে প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল। কার প্রসাদ কে খায়!" পূজারী ঠাকুর নিজেই যে তখন ঠাকুর হয়ে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন— "মানবদেহের চেয়ে আর কোন বড় তীর্থ নেই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ এমন আর কোথাও নয়। ঐ যে জগন্নাথের রথ তাও এই দেহরথের স্থূল রূপ মাত্র। এই দেহরথে আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগন্নাথ দর্শন।"

দেহরথের ভিতর ভগবান একথা শুধু শোনানো নয়, অন্যের দেহের ভিতর স্বপ্নে চিন্ময় শরীরে ফুটে উঠে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

সাঁইথিয়ার খগেনবাবু পুরী গিয়ে পান্ডার সাথে মন্দিরে গেছেন। অন্নভোগও গ্রহণ করেছেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, তার বাঁ হাতের বাহুমূল থেকে রক্ত ঝরছে। ওষুধের খোঁজ করতে গিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেখা পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তুই জগৎকে বলে দিবি মানুষের ভেতরই ভগবান। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এটাই যেন ওষুধ। অন্যথায় প্রাণশক্তির (রক্তের) অপচয় হতে থাকবে। মানুষ ভগবান হয়— এই সত্য জানলে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল হয়। তাই পুরীতে থাকাকালীন এক স্বপ্নে দেখলেন, উনি হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ দেখলেন, সর্বমঙ্গলার মন্দিরের বন্ধদুয়ার আপনা হতে খুলে গেল। ...

এবার দেখা যাক প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষের দেহে রথযাত্রার যৌগিক রূপ এবং পরে সমষ্টিগতভাবে মনুষ্যজাতির মধ্যে রথযাত্রার যৌগিক রূপটি।

ব্যষ্টির সাধনে, মূল মন্দির থেকে জগন্নাথের গুন্ডিচা বাড়ী যাত্রা বা সোজারথের মর্মার্থ— চৈতন্যশক্তির মূলাধার থেকে সহস্রারে যাওয়া। শিশুর জন্মের সময় প্রথমে সহস্রার (মাথা) তৈরী হয় পরে তা থেকে নিম্নাঙ্গ তৈরী হয়। এখানে মূলমন্দির মূলাধার ও গুন্ডিচা বাড়ী সহস্রারের প্রতীক। সাধনের পরিভাষায় এ হল আগমের সাধন। আর উল্টোরথ— জগন্নাথের গুন্ডিচা থেকে মূলমন্দির যাত্রা— সহস্রার থেকে কটিদেশে চৈতন্যের অবতরণ। নিগমের সাধন। এরপর নিত্যলীলা যোগ। দেহরথে* যে জগন্নাথ রয়েছেন তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে। চেপে রাখা যায় না— ব্রহ্মবিদ্যা স্মরণ মনন মাত্র মুহুর্মুহু সহজিয়া সমাধি ও অন্যান্য যোগৈশ্বর্য প্রকাশ পায়। যদিও এ জিনিস ব্যষ্টিতে আবদ্ধ।

সমষ্টির সাধনে, সোজারথ— ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত মানুষটির দেহরথ ছুটে চলে জগৎব্যাপ্ত হবার জন্য। তাঁর চিন্ময়রূপ ফুটে ওঠে মনুষ্যজাতির অন্তরে। এখানে মূলমন্দির হ'ল ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত মানুষটির দেহমন্দির আর গুন্ডিচা বাড়ী জগতের মনুষ্যজাতির সমষ্টিগত দেহঘরের প্রতীক। বিশ্বজনীন মানুষটি জগন্নাথ। জগৎচৈতন্য প্রসবিনী তাঁর স্থূল দেহটি জগন্নাথের মা। আর অপর মানুষের দেহ জগন্নাথের মাসি। রথযাত্রা মানে মাসির বাড়ি যাওয়া— নির্গুণ

**কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে (১/৩৫৭)— আত্মা রথী, দেহ রথ, ইন্দ্রিয়গণ ঘোড়া, বুদ্ধি সারথি ও মনকে লাগাম জানিবে।*

হতে (কৃষ্ণ) জ্যোতির্ময় (শ্বেতকায় বলরাম) দেহধারী (সুভদ্রা) হয়ে অপর মানুষের দেহে ফুটে ওঠা।

সমষ্টিতে উল্টোরথ— যাদের দেহাভ্যন্তরে এই সর্বজনীন মানুষটির প্রকাশ ঘটে তাদের অহং ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। তারা আত্মিকে এই মানবব্রহ্মের অঙ্গীভূত হয়। তারা উপলব্ধি করে আত্মিকে তারা নেই, বিশ্বদৈহিক মানুষ হয়ে এক তিনিই আছেন। তখন সম্পূর্ণ হয় রথযাত্রা।

বাংলাদেশে প্রথম রথযাত্রা উৎসব হয় হুগলীর শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশে। মাহেশ থেকে রথ যেত বল্লভপুরে। শ্রীচৈতন্যের এক অনুরাগী স্বপ্নে আদেশ পেয়ে এই রথযাত্রার সূচনা করেন। এর অল্প কয়েক বছর পর এখানে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ কিশোর বয়সে (১২/১৩ বছর বয়সে) দৈববাণী পেয়েছিলেন, 'মাহেশ ও বল্লভপুরে যা।' অর্থাৎ তাঁর অন্তর্জগতে রথযাত্রা (আগমের সাধন) তখন শুরু হয়েছে এবং তখনই সমষ্টিজীবনে রথযাত্রার কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে। বহুপরে তার স্বপ্ন হল (২৭/৬/১৯৬৬)— তিনি বলছেন— 'কাল রথের দিন, আমার জন্মতিথি।' অর্থাৎ অন্যের অন্তরে নিজেকে যেদিন সৃষ্টি করছেন, অপরে যখন তাঁর চিন্ময় রূপ দেহাভ্যন্তরে দর্শন করছে, সেই দিনটিই তাঁর জন্মদিন— তাঁর জগন্নাথ-স্বরূপের আবির্ভাবকাল।

তাই প্রচলিত কথায় বলা হয়, রথের দিন ভগবান ভক্তকে দেখা দেবার জন্য নিত্যধাম থেকে বের হন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ যখন পুরীতে ছিলেন, একজন ঝি বাসায় ঠিকের কাজ করত। সে একদিন রনজিৎ বাবুকে বলল, জীবনকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট যেন অন্যের উচ্ছিষ্টের সাথে না রেখে আলাদা রাখা হয়। জগন্নাথ নাকি তাকে স্বপ্নে বলে দিয়েছেন জীবনকৃষ্ণ আর তিনি (অর্থাৎ জগন্নাথ) এক। বহুশতাব্দীর সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সেই উড়িষ্যাবাসী ঝি বললে, 'উনি সাক্ষাৎ জগন্নাথ অছি। জগন্নাথ স্বপ্নে মোকে কহি দিলা।' এই ঝি জীবনকৃষ্ণের থালায় অবশিষ্ট খাদ্য মহাপ্রসাদ জ্ঞানে ভক্ষণ করত। শ্রীজীবনকৃষ্ণ যেখানে থাকতেন তার পাশের বাড়ি অচিন্ত্যধামের মালিক ছিলেন অতি দরিদ্র এক বিধবা। তিনি স্বপ্নে

দেখলেন জগন্নাথ তাকে বলছেন, চিন্তা করিস না, তোর কষ্ট দূর হবে। জীবনকৃষ্ণ অনুরাগীরা ঐ ঘরটি ভাড়া নিলে তার কষ্ট ঘুচল। পরে তিনি জানিয়ে ছিলেন, জগন্নাথ রূপে তিনি জীবনকৃষ্ণকেই দেখেছিলেন। এখনও বহু মানুষ তাঁকে জগন্নাথ রূপে স্বপ্নে দেখছেন। বোলপুরের শ্রীজয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী দেখেছেন— জগন্নাথের মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ— মনে হচ্ছে ইনিই জগন্নাথ। বেলঘরিয়ার সুনন্দিতা ঘোষ দেখেছেন— জগন্নাথের রথ চলেছে— ভীড় ঠেলে ভিতরে তাকিয়ে দেখেন জগন্নাথের পরিবর্তে রথে উপবিষ্ট শ্রীজীবনকৃষ্ণ। এই সেদিন ইলামবাজারের এক মা, আদরিণী চ্যাটার্জী এক স্বপ্নে দর্শন করলেন— পুরী গেছেন। সেখানে মন্দিরের ভিতর জগন্নাথ মূর্তি দেখছেন শ্রদ্ধাভরে। একসময় জগন্নাথের মুখ শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখ হয়ে গেল। যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। ঘুম ভাঙলো। ঐ এলাকার এক যুবক, নাম নিশীথ পাল স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর দেহটা যেন জগন্নাথের মন্দির, তার ভিতর শ্রীজীবনকৃষ্ণরূপী জগন্নাথ বসে আছেন হৃৎপিন্ডে।

৫/৩/১৯৬১তে শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখলেন— আলপুকুরে (দেশে) গেছেন। তিনতলা মাটির বাড়ী। দেওয়ালগুলো ঠিক সাদা নয়— light ash colour যেন। মাসীমাকে বললেন, আজ উল্টোরথ, শশধরের আসবার কথা ছিল, কই এখনও তো এল না? খুব ধীরে ধীরে শান্তভাবে মাসীমাকে (জ্ঞানমাকে) বলছেন। ...

সম্ভবত এই স্বপ্নে জানাচ্ছে, সমষ্টির সাধনে উল্টোরথ হয়েছে— কিন্তু তার পরিণতি স্বরূপ অসংখ্য মানুষের দেহে পাকাভক্তি র (শশধর—চন্দ্র—ভক্তিচন্দ্র) লক্ষণ 'আমি অকর্তা' জ্ঞানের ঠিক ঠিক প্রকাশ হয় নি। আরও সময় লাগবে।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের মধ্যে জগন্নাথ শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্রকাশ ঘটছে— পরবর্তী ধাপ, সর্বমানবের মধ্যে আত্মিক একত্বের প্রতিষ্ঠা।

ওঙ্কার রহস্য

ওম্ হ’ল একটি বিশেষ ধ্বনি— প্রণব ধ্বনি—নাদ, যা সকল মন্ত্রের আদি বীজ, সকল সাধনার মূল। আবার এই ত্রিমাত্রিক (অ, উ ম) ওঙ্কারই সর্বগত ও সর্বাতীত পূর্ণ ব্রহ্মের প্রতীক, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সত্ব-রজঃ-তম, ঋক-সাম-যজু, জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তি ইত্যাদির অতীত। অনুভূতির মাধ্যমে ওঙ্কার রহস্য ভেদ হলে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় (সত্ত্ব, রজঃ, তম— এই তিন গুণের অতীত) তুরীয়-নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, সাধক অক্ষরপুরুষকে প্রাপ্ত হন ও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এক কথায় ওঁ বা নাদ-ই ব্রহ্মের বীজ ও বিরাট অবস্থার প্রতীক।

(১) ওঁ— নাদ ব্রহ্ম— বাক্ ও প্রাণ যাহাতে সম্মিলিত হয়। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১/১/৬)। অন্তর্মুখী প্রাণশক্তি (কুণ্ডলিনী) সুরে জেগে ওঠে। একে বলে নাদ— আত্মা যে ধ্বনিরূপে প্রকাশ পান। এ কিন্তু দুটি বস্তুর আঘাতে উদ্ভূত সাধারণ শব্দ নয়। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে তবে ঈশ্বরীয় দর্শন অনুভূতি হয়। তাই সব মন্ত্রের আগে ওঁ উদগান করার নিয়ম আছে।

ওঁ কালীকায় নমঃ— মানে দেহস্থ কুণ্ডলিনী যে চিন্ময় কালীরূপ ধারণ করেন তাকে নমস্কার করি।

ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ— মানে কুণ্ডলিনী শক্তি দেহাভ্যন্তরে শ্রীবিষ্ণুর যে চিন্ময় রূপ ধরে ফুটে ওঠেন তাকে নমস্কার করি— ইত্যাদি। এই চিন্ময় রূপের কথা বোঝাতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “মাটি কেনে গো চিন্ময়ী প্রতিমা!”

পঞ্চমভূমিতে মন উঠলে প্রথম নাদ শোনা যায়। সাধক শোনেন বংশীধ্বনি, বীণার মধুর ঝংকার, নূপুরের ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি ইত্যাদি। এ যেন কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খে ফুঁ দেওয়া বা বংশীধ্বনি করা। এতে শ্রোতাদের জীবনে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ তথা জীবত্ব বনাম শিবত্বের যুদ্ধ শুরু হয়। আবার ভক্তির সংস্কার আছে যাদের সেইসব গোপীগণের মন ব্যাকুল হয় জগৎস্বামীকে পাবার জন্য।

নাদ শ্রবণে উপলব্ধি হয় ভগবানের নাম শুধু ধ্বনিমাত্র নয়। নামের মধ্যে নামীর অস্তিত্বের আভাস অনুভূত হয়। ফলে নামের প্রতি প্রীতি জন্মায় অজ্ঞাতসারে।

এরপর মন ষষ্ঠভূমিতে উঠলে কুণ্ডলিনী নানাবিধ চিন্ময় ঈশ্বরীয় রূপ, দেবদেবীর রূপ, ধারণ করে দেখা দেয়। বংশানুক্রমিক সংস্কারজ ঈশ্বরীয় রূপকে ইষ্টমূর্তি বলে। ষষ্ঠভূমিতে ইষ্টমূর্তি দর্শনের পূর্বে কখনও বা পরেও স্বপ্নে মন্ত্র লাভ হয়। এও নাদ। এখানে যেন নাদের খেই পাওয়া গেল। পরে নাদভেদ হবে। শেকলের পাব ধরে ধরে গিয়ে জলের ভিতর নোঙর পাওয়া যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ।

এরপর মন ওঠে সপ্তমভূমি সহস্রারে। সেখানেও নানারকম দৈববাণী বা আকাশবাণী শুনতে পাওয়া যায়। সেও নাদ।

কিন্তু এই নাদের পূর্ণ পরিচয় লাভ ও এর রহস্যভেদ হয় বেদান্ত সাধনের শেষ পর্যায়ে জড় সমাধির পর। তখন দেহীর সত্তা নাদে পরিবর্তিত হয়। নাদ— শেষ ধ্বনি (The last sound) — যার পর বোধাতীত অবস্থা— স্থিতসমাধি। এ সেই জাহাজের শেকলের পাব ধরে ধরে নোঙর পাওয়া। জাহাজ অর্থাৎ বোধ ব্রহ্মসমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। নাদতত্ত্বের পর শূন্যতত্ত্ব।

এরপর দেহে চেতনা ফিরে এলে সাধক উপলব্ধি করেন তার নিজের তথা জগতের অস্তিত্বের এক রূপ হ'ল নাদ বা ধ্বনি। শূন্যতত্ত্ব থেকে নাদতত্ত্ব— নাদতত্ত্ব থেকে রূপতত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— আমি ওঁ শুনি নাই, ঘণ্টার টং শব্দ শুনেছিলাম। নাদ হ'ল এই ধ্বনি আর ওঙ্কার হ'ল সম্পূর্ণ নাদের প্রতীক।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সমাধানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব String Theory-র সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। সেখানেও বলা হয়েছে— যেমন তার (String) থেকে জেগে ওঠে কম্পন— তা থেকে ধ্বনি— বিভিন্ন রাগ রাগিনী, তেমনি মহাশূন্য থেকে কম্পন (vibration) সৃষ্টি হয়েছে— তা থেকে বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ জগতের এক রূপ হ'ল কম্পন— ধ্বনি। নাদভেদ হলে সাধক বোঝেন, নাম ও নামী অভেদ।

নাদভেদের কথা শোনামাত্র ঐ সাধকের মহাবায়ু জাগ্রত হয়, মাথা সামনে পিছনে নড়তে থাকে যেন ডুবছে উঠছে— ডুবছে উঠছে, পরে একেবারে ডুবে যায়— সমাধিস্থ। সমষ্টির সাধনে এর লক্ষণ হ'ল— যার

নাদভেদ হয়েছে তাঁর নাম করলে তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শন হয়। ব্রহ্মসূত্রে তাই বলা হয়েছে, ‘‘সম্পদ্য আবির্ভাব স্বেন শব্দাৎ।’’

(২) মাণ্ডুক্য উপনিষদ অনুসারে ওঁ প্রতীকটি সৃষ্টি হয়েছে অ + উ + ম + O (অমাত্র মাত্রা) যোগে।

এখানে— ‘অ’— জাগ্রত অবস্থার প্রতীক। এই অবস্থায় ঈশ্বরীয় চিন্তার উন্মেষ হয়। তাই প্রতীকে আদি অক্ষর নেওয়া হ’ল।

উ— স্বপ্নাবস্থার প্রতীক। দেবস্বপ্নে জীবত্বের ক্রিয়া থাকে না। তাই এই স্বপ্নের অনুভূতি জাগ্রত অবস্থার অনুভূতির চেয়ে শুদ্ধতর। উৎকর্ষতা বোঝাতে ‘উ’ কার নেওয়া হ’ল।

ম— সুষুপ্তি (নিদ্রিত অবস্থা)-র প্রতীক। পরিমাণ বা মিতি বোঝাতে ‘ম’। নিদ্রিত অবস্থায় দেহটি আত্মার পারমাপক বা বিলয় স্থান। ধান মাপার সময় তা পাত্রে ভরা ও বের করার মধ্যবর্তী দশায় পাত্রের মধ্যে ধান স্থির থাকে, ফলে মাপা হয়। দেহপাত্রে সুষুপ্তি অবস্থায় যেন আত্মাকে মাপা হচ্ছে এরূপ কল্পনা করেছেন ঋষিরা।

O (অমাত্র মাত্রা)— তূরীয় অবস্থার প্রতীক।* আমরা যখন স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন দেখি অথবা যে স্বপ্নে কুয়াশা প্রতীকটি বর্তমান থাকে তাকে তূরীয় দর্শন বলে। এটি স্বপ্ন অবস্থার চেয়ে উচ্চতর আত্মিক অবস্থা। এই অবস্থায় দেহজ্ঞান বা জীবত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, ব্রহ্মের সাথে দেহীর অভেদ জ্ঞান হয়। তাই এ অবস্থা বোঝাতে কোন অক্ষর নেওয়া হয়নি। অমাত্র বা মাত্রাশূন্য মাত্রা ধরা হয়েছে।

**নাদভেদের পর প্রাণশক্তি স্থিত সমাধিতে নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হয়। পরে সাধকের আত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়, স্বপ্নের পারে গিয়ে (জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূতির পারে গিয়ে) তূরীয় অবস্থায় নির্গুণব্রহ্মের প্রকাশ হয়। তূরীয় অবস্থার প্রতীক কুয়াশা। স্বল্পশুভ্র কুয়াশায় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলো রূপে তূরীয় নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ সাধক প্রত্যক্ষ করেন।*

এই অবস্থা সত্ত্ব রজঃ তম— তিন গুণের পার, জাগ্রত সুষুপ্তি ও স্বপ্নদশার ঊর্ধ্বে এবং আত্মিক বিকাশের সৃষ্টি স্থিতি লয় দশার পরের অবস্থা।

যিনি জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও তূরীয়— জীবনের এই চার অবস্থাতেই দেহস্থ চৈতন্যের বিকাশে ব্রহ্মের সাথে অভেদ বোধ করেন তারই ওঙ্কার রহস্য ভেদ হয়েছে। তিনি জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তির স্বাদ অনুভব করেন।

(৩) আবার পুরাণ মতে ওঙ্কারের অ—উ—ম, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের প্রতীক।

সৃষ্টি কি'না দেহেতে আত্মার সাক্ষাৎকার। নিজেকে সৃষ্টি (Creation of Real Self)। সারা দেহে ছড়ানো প্রাণশক্তি সহস্রারে সংকলিত ও রূপান্তরিত হয়ে আত্মার রূপ ধারণ করে। আত্মা সন্তানের জন্ম হয়।

স্থিতি হ'ল— আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন ও ধারণা করা। সাধক অন্তরে জগতের বিভিন্ন স্থান দর্শন করেন। পরে বাস্তবে মিলিয়ে নেন। একে বলে আংশিক বিশ্বরূপ দর্শন, Part for the whole। দীর্ঘকাল ধরে এরূপ অসংখ্য দর্শন হয়ে শেষে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বরূপ দর্শন হয়। দেহের মধ্যে আত্মা। আত্মার মধ্যে জগৎ। ভিতরের জগৎ ও বাইরের জগৎ এক (Identical)। উপলব্ধি হয়, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে ভাণ্ডে (দেহে)।

আর প্রলয়— নানা দর্শন অনুভূতি লাভের পর নাদ (the last sound) শুনে নির্গুণে বোধাতীত অবস্থায় লয়, ব্যষ্টি সত্তার লয় ও নিজের মধ্যে বিশ্বজনীন সত্তার (Universal Self-এর) জাগরণ— পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের উপরোক্ত অনুভূতি লাভই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়— ওঙ্কার সাধন।

রামায়ণে ওঙ্কার প্রতীকের বিস্তার

রাবণ বধের জন্য নারায়ণ চার অংশে ভাগ হয়ে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু কেন? ওঙ্কারের প্রতীক তত্ত্ব বিস্তৃত রূপ পেয়েছে এখানে। রাবণ অর্থাৎ অহং নাশের জন্য জীবনের চারটি অবস্থাতেই দেবত্বের প্রকাশ হওয়া চাই।

রাম— এক, সূচনা— 'অ'— জাগ্রত অবস্থায় ঈশ্বরীয় প্রকাশ। 'রাম মানে কালো। প্রাচীনকালে এই অর্থ প্রচলিত ছিল'— সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। কালো— রহস্যময়তার প্রতীক। জাগ্রত অবস্থায় জীবত্ব থাকে বলে আত্মিক রহস্যের সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন হয় না। এই অবস্থায় দেহী কৌশল অবলম্বন করে

সত্যকে বিকৃত করতে পারে। তাই কৌশল্যার (দেহ) পুত্র রাম আত্মার প্রথম পাদ।

লক্ষ্মণ— 'উ'— স্বপ্নাবস্থায় দেবত্বের ক্রিয়া। জাগ্রত অবস্থায় ঈশ্বরীয় দর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে সত্য নির্ণয় সম্ভব হয় না। সত্যের প্রমাণ বা লক্ষণ ফুটে ওঠে স্বপ্নে। তাই সর্বদা রামের সঙ্গে থাকে লক্ষ্মণ। অন্য সকলের অবধ্য ইন্দ্রজিৎকে বধ করে ইনি রাবণ বধ সহজ করেন। ব্রহ্মত্বলাভে দেবস্বপ্নেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

ভরত— 'ম'— নিদ্রিত অবস্থায় আত্মিক পরিবর্তনের প্রতীক। নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল স্বকর্মে বিরত থাকে। একমাত্র প্রাণবায়ু সমূহ ক্রিয়াশীল। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের সদাপ্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়। 'প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন পুরে জাগ্রতি'— অর্থাৎ এই দেহরূপ পুরে নিদ্রাকালে অগ্নিস্বরূপ প্রাণবৃত্তি সমূহই (প্রাণাদি বায়ু) জাগিয়া থাকে (প্রশ্ন উপনিষদ ৪/৩)। অগ্নির অপর নাম ভরত— যাকে ভরণ পোষণ করতে হয়, জ্বালানী যোগাতে হয়। যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন আমাদের দেহ হ'ল কৈকেয়ী— কে কার এই ভাব যার। 'মানুষের এত নপরচোপড়, যখন ঘুমোয় কুকুরে মুখে মুতে দিলেও টের পায় না'— শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কৈকেয়ীর পুত্র ভরত নিদ্রিত অবস্থায় প্রাণশক্তির বিকাশকেই বোঝায়।

শত্রুঘ্ন— O (শূন্য)— তূরীয় অবস্থায় ঈশ্বরীয় বিকাশ। শত্রুঘ্ন মানে শত্রুকে হনন করে যে। আমাদের একমাত্র শত্রু হ'ল আমাদের অহংকার। তূরীয় অবস্থায় ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ বোধ হলে দেহী বোঝে সে কিছু নয়, ভগবানই সব। তখন অহং সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শত্রুঘ্ন লবন দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন অর্থাৎ সকল প্রকার ভোগের আকর্ষণ, যাকে Salt of life বলে মনে হয়, বস্তুত লবন দৈত্য, তারও বিনাশ ঘটে।

স্বপ্ন ও তূরীয়— এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। তৃতীয় দর্শন বস্তুত স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখা। তাই লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রার পুত্র। সাধকের দেহটি এখন ভগবানের মিত্রা কারণ দেবস্বপ্নে আত্মার লীলা হলে বোঝা যায় দেহ বা আদ্যাশক্তি যথার্থ প্রসন্ন হয়েছে।

কৃষ্ণজন্মরহস্য

মহাভারতের কৃষ্ণ দুই কৃষ্ণ চরিত্রের সমন্বিত রূপ। একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অপরজন অনার্য যোদ্ধা। আর্য ও অনার্য সমন্বয়ের জন্য দুই কৃষ্ণকে এক করা হয়েছে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। রাজা দেশ চালায় না। দেশ চালায় সন্ন্যাসী তথা সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা। তাই মহাভারতের নায়ক হলেন সত্যদ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যুদ্ধে বিরত ছিলেন। আবার তাকে সারথি করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোয় পরোক্ষে যোদ্ধাও বলা হ'ল। তিনি আর্যসন্তান হয়েও মানুষ হলেন নিচু জাতি গোয়ালাদের ঘরে, অনার্য সমাজে। অনার্যদের গুরুত্ব ও সম্মান দেবার জন্য বলা হ'ল যে কৃষ্ণের কাছে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র খুব জব্দ হয়েছিলেন।

মহাভারতের মূল শিক্ষা হ'ল অভয়পদ লাভ করে অর্থাৎ আমি একাই আছি এই জ্ঞান লাভ করে জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি— সশরীরে স্বর্গারোহণ। এইটি বেদমত। কিন্তু অনার্য কৃষ্টির অবতারবাদকে সম্মানের সঙ্গে কাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে যুক্ত হ'ল বৃন্দাবনলীলা এবং গীতার উপদেশ, যেখানে ভক্তিরই প্রাধান্য। দ্বারকার কৃষ্ণ আর্যকৃষ্টির অপরদিকে বৃন্দাবন নায়ক অনার্যকৃষ্টির প্রতিভূ। বৃন্দাবন বস্তুত প্রতীক নাম। বর্তমান বৃন্দাবনের কথা নয়। বর্তমান বৃন্দাবন মহাপ্রভুর সৃষ্টি। বৃন্দা রাধার ষোড়শ নামের একটি। বৃন্দাবন হ'ল বৃন্দা অর্থাৎ রাধার ক্রীড়াবন।

কৃষ্ণ কাহিনীতে বেদান্তের জ্ঞানের সাথে অবতারবাদের ভক্তিতত্ত্বের সমন্বয় হয়েছে। মূল লক্ষ্য আর্য অনার্য সমন্বয় ও অনার্যদেরকেও আর্যকৃষ্টির সত্য সম্পর্কে অবহিত করা। সেই বৈদিক সত্য কিভাবে কৃষ্ণ জন্ম কথায় প্রতীকায়িত রূপ পেয়েছে আলোচ্য নিবন্ধে সেদিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতে কংসের মৃত্যু হবে— এই দৈববাণী শুনে কংস দেবকী ও তার স্বামী বসুদেবকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন।

কংস— দেহধারণের সাথে সাথে জাগে দেহাত্ম বোধ। আমি এই দেহ— এই জ্ঞান। ইনি মামা অর্থাৎ দেহাত্মবোধ সর্বজনীন। এই কংসের দুই স্ত্রী। অস্তি আর প্রাপ্তি। অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অর্থে স্ত্রী। দেহাত্মবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দুই মনোভাব। অস্তি ও প্রাপ্তি। অস্তি অর্থাৎ আমার এত ঐশ্বর্য আছে, আমি এত সম্পদের মালিক— এই বোধ। প্রাপ্তি অর্থাৎ আয় বা উপার্জন। আমি নিজ যোগ্যতায় পৌরুষবলে এত ঐশ্বর্য অর্জন করেছি বা প্রাপ্ত হয়েছি এই মনোভাব।

দেবকী— দৈবী দেহ, আত্মিক স্ফুরণের উপযুক্ত দেহ।

বসুদেব— দেহস্থ প্রাণশক্তি যা এই দেহকে ধরে রেখেছে— দেহের সকল ক্রিয়ার মূল চালিকাশক্তি— স্বামী বা প্রভু।

কংসকারাগার — দেহ কারাগার।

এই দেহধামে অর্থাৎ মনুষ্যশরীরের অভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দ চিদ্‌ঘনকায় কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে। এই দেহই ভগবানের লীলার আধার। তাই জগদ্‌গুরুকে দেহ দান করতে হয়। ভক্ত উপলব্ধি করে—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাইতো আমি এসেছি এই ভবে।।

মূলাধার থেকে অন্তর্মুখী প্রাণশক্তির ঊর্ধ্বমুখী যাত্রাকালে দেহ ও প্রাণশক্তির নিরন্তর সংঘর্ষণের ফলে দেহ থেকে প্রাণশক্তির নির্যাস আত্মা নিঃসৃত হয়—পরিণতিতে কৃষ্ণের জন্ম হয়।

দৈবীদেহে চৈতন্য শক্তির জাগরণে প্রতিভূমির সাধন শেষে সাধনের ফল স্বরূপ বিশিষ্ট অনুভূতি হয়, প্রতীকে পুত্রলাভ হয়।

দেবকীর পরপর ছয়টি গর্ভজাত সন্তানকে কংস নিজ বাহুবলে হত্যা করল অর্থাৎ ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত সাধন ও দর্শন অনুভূতি সাধক নেতি নেতি বিচার করে অগ্রাহ্য করল। জন্ম হল সপ্তম গর্ভে বলরামের বা বলভদ্রের।

সপ্তম গর্ভের পুত্র বলরাম বা বলভদ্র— বলভদ্র মানে শ্রেষ্ঠ বলশালী ব্যক্তি। বলভদ্র জন্মাল মানে সপ্তম ভূমিতে আত্মাসাক্ষাৎকার বা ভগবান দর্শন হ'ল। এরপর বেদান্তের সাধন হয় ও পরে সহস্রারে চৈতন্য সাক্ষাৎকার হয়। এই চৈতন্য সহস্রার থেকে কটিদেশে অবতীর্ণ হয়। তাই বলা হ'ল— বলভদ্রকে বিষ্ণু রোহিনীর গর্ভে স্থানান্তরিত করলেন। রোহিনী শব্দটি আরোহী শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। আরোহ মানে কটিদেশ। রোহিনী মানে দাঁড়াল বিশেষ কটিদেশ সম্বলিত নারী তথা ঈশ্বরকটি মানুষ, যার চৈতন্য সহস্রার থেকে কটিদেশে অবতীর্ণ হয় ও মানুষ রতনের রূপ নিয়ে সর্বদা হরিনাম করে।

বাউল গানে আছে— এই মানুষে আছে রে মন, যারে কয় মানুষ রতন। ছোট্ট দেহী এই মানুষরতনের সারা কপালজুড়ে চন্দনের ফোঁটা, ঠিক

বর বিয়ে করতে যাবার সময় যেমন পরে। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করেন আর দ্রষ্টার হাতের তালু কিরকির করে ওঠে।

বলরাম নামের মধ্যে মানুষরতনের হরিনাম করার ও দ্রষ্টাকে রাম নাম সদা বলতে উদ্দীপিত করার ইঙ্গিতটিও সুস্পষ্ট। মানুষরতন দর্শন করে— দ্রষ্টা নানাভাবে ভক্তিরস আস্বাদন করে ও তার আত্মিক অবস্থা (বলরাম অবস্থা) ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এককথায় বলরাম বলতে সাধকের সপ্তমভূমিতে ভগবান দর্শন, চৈতন্যের সাক্ষাৎকার ও তার কটিদেশে অবতরণ ও মানুষরতন দর্শন হয়ে প্রাপ্ত অবতারত্বকে বোঝায়।

বলরাম অবতার— কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। ভগবানত্ব প্রকাশ পেলে অবতারত্ব ঘুচে যায়। বলরাম শেষ নাগের অবতার— অবতারত্বেই কুণ্ডলিনী যোগে ব্যষ্টির সাধনের পরিসমাপ্তি। তাই বলরামের দেহ যাবার সময় তার মুখ থেকে সহস্রফণাযুক্ত এক সর্প অর্থাৎ কুণ্ডলিনী বেরিয়ে সমুদ্রে অর্থাৎ জনসমুদ্রে মিশে গেল— জনসমুদ্রে তার ব্রহ্মত্ব বা দেবত্ব পরিব্যাপ্ত হ'ল। কৃষ্ণের প্রকাশ হল।

কৃষ্ণ অষ্টম গর্ভের সন্তান। বেদ সপ্তভূমির কথা বলেছে। এর ঊর্ধ্বে গিয়ে বেদান্তের সাধনের পর পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয়। আত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়। কৃষ্ণের জন্ম হয় দেহাভ্যন্তরে। এই সময় সহস্রারে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ রেখা দর্শন হয়— প্রতীকে বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমক দেখা যায়। তাই বলা হয় ভাদ্রমাসে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে জন্মাষ্টমী রাত্রে কৃষ্ণের জন্ম হয়। বৃষ্টি এখানে কৃপাবৃষ্টির প্রতীক। রাত্রে অর্থাৎ মনুষ্যজাতির অজ্ঞাতসারে এই অপূর্ব আত্মিক বিকাশ ঘটে। জন্মের পর কৃষ্ণকে যমুনার অপর পাড়ে, নন্দরাজের গৃহে রেখে আসা হ'ল। ব্যষ্টিতে জন্ম নেওয়া সমষ্টি চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হ'ল সমষ্টিতে। ব্যক্তিজীবন থেকে সমষ্টি জীবনে উত্তরণ হ'ল— জীবননদীর অপর পাড়ে, অন্য জীবনে গেল। কৃষ্ণ এখন ভূমিষ্ঠ হয়েছে— জগতে প্রকাশিত—সাধকের এই দেবশক্তি নিজ দেহসীমা ছাড়িয়ে অন্যের অন্তরে দেবত্ব জাগিয়ে তোলে। সাধকের চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে তার অজ্ঞাতসারে অসংখ্য মানুষের অন্তরে। ছান্দোগ্য ঠিক এই কথাই বলেছে— "অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়, পরং জ্যোতি উপসম্পদ্য, স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ।

কৃষ্ণের জন্মের সাথে সাথে একই সঙ্গে নন্দরাজার কন্যা জন্মাল। অর্থাৎ

কারণশরীরের লীলা শুরু হল। এই স্থূলদেহ থেকে আর একটি দেহ সৃষ্টি হলে তবে ঈশ্বরীয় লীলা দেখা যায়। তাকে বলে ভাগবতী তনু বা কারণশরীর।

যারা ঐ সাধকের চিন্ময় রূপ অন্তরে দর্শন করেন— তাদের কারণশরীর ঐ রূপ ধারণ করে— তাই কন্যা পরিবর্তে নন্দ কৃষ্ণধনকে পেল। তখন এক কারণশরীরই যে বহু ইষ্টমূর্তির (শিব, কালী, রাম ইত্যাদি) রূপ ধারণ করে, এই সত্য নন্দের ন্যায় মানুষ জানতে পারে ও মায়ামুক্ত হয়। বোঝে ইনি উত্তম পুরুষ— পুরুষোত্তম। সবার উপরে মানুষ সত্য। মানুষে তার বেশি প্রকাশ, বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নন্দ মানে আনন্দ। নন্দ রাজা— দেবস্বপ্নে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত মানুষের চিন্ময় রূপে তারই ব্রহ্মত্ব লাভ করে ব্রহ্মানন্দে অভিষিক্ত হন যিনি। তিনি বুঝতে পারেন তিনিও অনন্ত আত্মিক সম্পদের অধিকারী অর্থাৎ রাজা।

কংস বসুদেবের কাছ থেকে নন্দের কন্যাকে নিয়ে তাকেই অষ্টমগর্ভের সন্তান জেনে বধ করতে উদ্যত হলে সে অদৃশ্য হল ও বলল "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"। গো—গাভী— ভক্ত। উত্তম ভক্ত হুড় হুড় করে দুধ দেয়— শ্রীরামকৃষ্ণ। গোকুলে মানে ভক্তদের তথা যে সব মানুষের আত্মিক জীবন লাভ হয়েছে তাদের জগৎ— বহু দৈবী মানুষের জগৎ— এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ।

কৃষ্ণ— নির্গুণ ব্রহ্ম— পরম এক, অখন্ড সচ্চিদানন্দ। গোকুলে বাড়িবে সে, কিন্তু কীভাবে? প্রথমে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে ফুটতে থাকেন অন্য বহু মানুষের অন্তরে, পরে ভগবান বা আত্মা রূপে— তারপর পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মরূপে (সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষরূপে) ফুটতে থাকেন। শেষে তিনি পরম এক বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপে অনুভূত হন। তখন তাঁকে কেন্দ্র করে আত্মিকে সব মানুষই যে এক, এই সত্য অনুভূতি সাপেক্ষে স্পষ্ট হয়। বহুজনের মুখে তাদের এরূপ অনুভূতি শুনে ঐ সাধকের জীবনে কংস বধ হয়।

কংস বধ— দেহাত্মবোধের অপসারণ ও আত্মিকে বহু নেই আছে এক— এই উপলব্ধি। দেখছি এক রামই সব হয়ে রয়েছে— শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন দেহের আবরণও বহুর বোধ জাগাতে পারে না। একজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। তখন দ্বৈতবাদে ভক্ত ভগবানের লীলা তথা বৃন্দাবনলীলার উচ্ছেদ হয়— কৃষ্ণ রাজা হয় মথুরায়। মথুরা অর্থাৎ সহস্রারে মনের স্থিতিলাভে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে কৃষ্ণরূপকের মধ্যেই অবতারত্ব অতিক্রম করে একজন মানুষের ব্রহ্মত্ব তথা বিশ্বব্যাপীত্ব লাভের ও একত্ব প্রতিষ্ঠার বৈদিক সত্যটি সুনিপুণভাবে বিবৃত করা হয়েছে।

মধুবিদ্যা

বেদে ব্রহ্মবিদ্যাকে পরাবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, মধুবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও মধুবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা পুরোপুরি সমার্থক নয়। বেদান্তের সাধন সম্পূর্ণ হবার পর ব্রহ্মবিদ্যার অন্তিম পর্যায়ে (last phase) মধুবিদ্যা শুরু হয়। ব্রহ্মবিদ্যা যেন একটি বড় বৃত্ত। মধুবিদ্যা তার মধ্যে একটি ছোট বৃত্ত।

ঊর্ধ্বরেতা না হলে মধুবিদ্যা লাভ হয় না। রেত বহির্মুখী বা নিম্নগামী হয়ে সন্তান উৎপাদন করে। মানুষ নিজেকেই সন্তানরূপে সৃষ্টি করে— আত্মজ। পুত্র দর্শনে পিতার গাঢ় আনন্দ। কারণ পিতা নিজেকেই দেখছেন বহুরূপে। পিতা—সৃষ্টিকর্তা— এক।

জীববিজ্ঞান মতে পিতার জনন কোষ (গ্যামেট) রেতঃনালী (ভাসা ডিফারেন্স) থেকে কোনভাবে বাইরে নিক্ষিপ্ত না হলে তিন সপ্তাহ সেখানে থাকার পর তা দেহে পুনরায় শোষিত (absorb) হয়। কামহীন পূর্ণ পবিত্র (flawless) একটি দেহে ষোলআনা রেতঃ আপনা হতে অন্তর্মুখীন হলে তিনি ঊর্ধ্বরেতা হন। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলছেন মহামায়ার কী আশ্চর্য কৃপা জীবনে কখনও স্বপ্নদুষ্টও হলাম না। এই অটুট ব্রহ্মচর্যে বীর্যবান সাধকের প্রাণচৈতন্য ঊর্ধ্বমুখী হয়ে সহস্রারে গমন করে। ব্রহ্মবিদ্যার নানান অনুভূতি হয়ে এক বিশেষ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ মধুবিদ্যা লাভ হলে সহস্রারে মধুপাত দর্শন হয়। এর পরিণতিতে অর্থাৎ মধুবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মত্বলাভকারী ঐ মানুষটির চিদ্ঘনকায় রূপ অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠে ও আত্মিকে নিজেকে অসংখ্য রূপদান সম্ভব হয়— "একোহম বহুস্যাম" প্রার্থনা পূরণ হয়। এখানে পুত্র বহু কিন্তু বহুরূপ নয়, একটিই রূপ— পিতার রূপ।

সহস্রারে যে মধুপাত দর্শন হয় সেই মধু চৈতন্যের প্রতীক (consciousness–knowledge)। বাইরে রয়েছে নানা দেশের নানা জাতির নানা সম্প্রদায়ের নানা শ্রেণীর মানুষ কিন্তু আত্মিকে সকলের ভিতর একজন মানুষ— এই বোধ-ই চৈতন্য। বহুর মাঝে সেই এক চিরমানবের প্রকাশে বহুত্বে একত্ব লাভে জগৎ মধুমতী হয়। বহুত্বে একত্বের পরিণতির কথাই ঘোষণা করেছে ঋক্‌বেদের মধুমতী সূক্ত। সেখানে বলা হয়েছে "মধু বাতা

ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধী, মধু নক্তমুতোষসো। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ। মধুমান অস্তু সূর্যঃ, মাধ্বীঃ গাবো ভবন্তু নঃ।"

এর সরলার্থ— ঋতকামীর (সত্যপ্রার্থীর) জন্য বায়ুসমূহ মধুক্ষরণ করে, নদী সমূহ মধুক্ষরণ করে। ওষধিসমূহ মধুময় হোক। দিন ও রাত্রি মধুময় হোক। ধরণীর ধূলিকণা ও আমাদের পিতা দ্যৌ অর্থাৎ আকাশ মধুমান হোক। বনস্পতি আমাদের নিকট মধুময় হোক। সূর্য ও গাভী সমূহ আমাদের নিকট মধুমান হোক।

এখানে মধুবিদ্যার পরিণতির কথা বলে গেছে। কবে কোন যুগে কার হয়েছিল— শ্রুতিতে চলে আসছে। সে বাইরে জগৎ মধুমতী দেখছে। ভিতরের কথা বলতে পারছে না। চোখে ন্যাবা না লাগলে তো আর চারদিকে ন্যাবা দেখা যায় না। তবে মধুবিদ্যার বিষয়ে সংক্ষেপে ও সাংকেতিক ভাষায় আলোকপাত করেছে ছান্দোগ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে মধুবিদ্যার কথায় আছে— "ওঁ অসৌ বা আদিত্য দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীন বংশোন্তরিক্ষম্ অপূপ মরীচয়ঃ পুত্রাঃ।"

এর সরলার্থ— ঐ সূর্য দেবতাদের মধু। তার (সূর্যের) অবলম্বন দ্যৌ। সেই দ্যৌ বা আকাশ যেন বাঁকা (তীর্যক) একটি বাঁশ। তার নীচে বিধৃত আছে মৌচাক (অপূপঃ)-সম অন্তরীক্ষ। আর অন্তরীক্ষের সূর্য হ'ল মৌচাকের ভিতর মধু। মরীচয় অর্থাৎ কিরণসমূহই মৌমাছির শাবকদল (পুত্রাঃ)।

দেহতত্ত্বে (Microcosm-এ) এর অর্থ— সহস্রারে (চিদাকাশে) স্বপ্নে ও ধ্যানে আর একটি সূর্য দেখা যায়— প্রাণসূর্য। এই সূর্যও দেবমধু। মানুষই দেবতা। অন্য কোন দেবতা নাই, তাই দেবমধু মানে সর্বজনপ্রিয়।

আকাশের সূর্য সকলকার— বাইরের চৈতন্যস্বরূপ। তাই প্রার্থনা— তমসো মা জ্যোতির্গময়। সহস্রারের সূর্য— একত্বের চৈতন্যস্বরূপ— বহুত্বে একত্ব।

আকাশের সূর্যের অবলম্বন দৌঃ— এই দ্যুলোক।

সহস্রারের সূর্যের অবলম্বন হ'ল তূরীয়-নির্গুণ ব্রহ্ম। বেদান্ত সাধন সম্পূর্ণ হবার পর দেহে চেতনা ফিরে এলে সাধক তত্ত্বজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়।

এরপর নির্গুণ ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল হয়ে তূরীয় অবস্থায় প্রকাশ পায়। দর্শন হয়— স্বল্প শুভ্র কুয়াশায় ফিকে জ্যোৎস্নার আলো।

অন্তরীক্ষ (শূন্য) যেমন বাইরে আছে তেমনি দেহের ভিতর সপ্তমভূমিতে অন্তরীক্ষ দেখা যায়।

অন্তরীক্ষ যেন মৌচাক। অন্তরীক্ষে সূর্য যেন মৌচাকের ভিতর মধু। এটি একটি উপমা। অন্তরেও বটে বাইরেও বটে।

বাইরের সূর্য থেকে যেমন কিরণ বিকিরিত হয়, সহস্রারেও চৈতন্যের লাল আলো দপ্ করে জ্বলে উঠতে দেখা যায় ও পরে মধুপাত দর্শন হয়।

সূর্যকিরণের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে উপরে ওঠে ও বৃষ্টির জল হয়ে ঝরে পড়ে। তেমনি ঊর্ধ্বরেতা পুরুষের সহস্রারে চৈতন্য সাক্ষাৎকার ও পরে মধুপাত দর্শনের পরিণতিতে মনুষ্যজাতির (জনসমুদ্রের) বহু মানুষের প্রাণশক্তি তাদের সহস্রারে উঠে আসে ও তা ঐ মানুষটির চিদ্‌ঘনকায় রূপে রূপায়িত হয়। যেন পিতা নিজেকে বহু পুত্র রূপে সৃষ্টি করছেন আত্মিকে। এই-ই ‘‘একোহম্ বহুস্যাম’’ কথাটির বাস্তব রূপ। সাধকের অন্তরে সূর্য— সূর্যের কিরণ মধু। অন্তরে জগৎ— শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় ‘রা’ (‘ম’ মানে ঈশ্বর, ‘রা’ মানে জগৎ)। সমুদ্রে ঝিনুক সমূহ স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য হাঁ করে বিচরণ করে। মনুষ্যজাতি (জনসমুদ্রের বহু মুমুক্ষু মানুষ) সেইরূপ মধু বা একত্বের পিয়াসী। সূর্যকিরণ বা মধু যেন তাদের ভিতর অপূপ (মধুপিষ্ট)। মধুবিদ্যালাভকারী মানুষটির অন্তর-আকাশ থেকে পড়ে— ঝিনুকের ভিতর মুক্তাসম তাঁর চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে। মধুবিদ্যার দ্বারা একজন মানুষের চিদ্‌ঘনকায় রূপ সংখ্যাতীত আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তরে ফুটে উঠে বহুত্বে আত্মিক একত্ব প্রতিষ্ঠা করে— জগৎ হয় মধুমতী।

সচ্চিদানন্দগুরু লাভে ব্রহ্মবিদ্যার সূচনা হয়। ঊর্ধ্বরেতা হলে পূর্ণাঙ্গ ব্যষ্টির সাধন হয়ে আত্মা সাক্ষাৎকার হয়, বেদান্ত সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পর অহংশূন্য অবস্থায় তূরীয়নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। সূচনা হয় মধুবিদ্যার। দেহীর প্রাণশক্তি তখন চৈতন্য শক্তিতে পরিণত হয়। সহস্রারে লাল দীপকের আলোসম চৈতন্য সাক্ষাৎকার হয়। মধুর রঙ যেমন লালচে সেই রকম। মধু

চৈতন্যের প্রতীক— দ্বিতীয় স্তরে। এর প্রায় বারো বছর চার মাস পরে সহস্রারে মধুপাত দর্শন হয়। অতঃপর তাকে বেশকিছু মানুষ অন্তরে দর্শন করতে থাকে, তার সত্তা লাভ করে, তাদের নিয়ে দীর্ঘকাল (১২ বছর ৪ মাস) নিরবচ্ছিন্নভাবে দর্শন অনুভূতির অনুশীলন করতে থাকলে মধুবিদ্যা দেহেতে বর্তায়। তিনি মধুবিদ্যার মূর্তরূপ (Modhuvidya personified) হয়ে ওঠেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর চিন্ময় রূপ অন্তরে দেখতে থাকে। মনুষ্যজাতির মধ্যে আত্মিক একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়— জগৎ মধুমতী হয়। এই তত্ত্বের বাস্তব তথ্যনিষ্ঠ প্রমাণ ফুটেছে রামকৃষ্ণ পরবর্তী মহামানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে বেদান্তের সাধন সম্পূর্ণ হবার পর তূরীয় অবস্থায় নির্গুণব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছিল স্বল্প শুভ্র কুয়াশায় ফিকে জ্যোৎস্নার আলো রূপে। পরে সহস্রারে দপ্ করে দীপকের লাল আলো দর্শন অর্থাৎ প্রথমস্তরের চৈতন্য সাক্ষাৎকারও হয়েছিল। এর ১২ বছর পর মধুপাত দর্শন হ'ল। বিশিষ্ট এক স্বপ্নে তিনি দেখলেন, তাঁর বিছানার ডবল বিছানা— সাদা ধবধবে চাদর ঢাকা। তার উপর ৪/৫ ফোঁটা মধু পড়েছে। উনি হাত দিয়ে তা মুছে ফেলতে গেলেন কিন্তু মুছতে গিয়ে বেড়ে বেড়ে সারা বিছানাটা মধুতে আপ্লুত হয়ে গেল। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, মধুর রং লালচে— চৈতন্য সাক্ষাৎকারের সময় যে দীপকের আলো দেখেছেন, অনেকটা তারই মতো। তাহলে মধু চৈতন্যের প্রতীক আর মধু দেখা চৈতন্য সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হবে।

এরপর তাঁর এক অনুরাগী নগেন বাবু স্বপ্নে দেখলেন, বাজারে সরু নল দিয়ে মধু বিতরণ হচ্ছে— সেখানে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। এখানেও মধু চৈতন্যের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি। দেখাচ্ছে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছ থেকে দ্বিতীয় স্তরে চৈতন্য লাভ করবে জগতের মানুষ (বাজারের লোক)।

তারপর বেহালার সত্যবাবু স্বপ্নে দেখলেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণের সারা মাথাটা জুড়ে একটা মৌচাক, তাতে মৌমাছিরা এসে বসেছে। জিনিষটা পরিণতির দিকে এগোতে লাগল।

এরপর পাড়ার একটি ছেলে, নাম শীতল, যে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরের

ভগবৎচর্চা সম্পর্কে কিছু জানে না, সে স্বপ্ন দেখল, শ্রীজীবনকৃষ্ণের সারা দেহটা মৌচাক হয়ে গেছে আর সাদা ধবধব করছে।

সত্যবাবু ও শীতলের স্বপ্নের আগে অভয়পদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন স্বপ্নে দেখেছে সূর্যমণ্ডলের ভিতর শ্রীজীবনকৃষ্ণ রয়েছেন।

ব্রহ্মসূত্রের english translation-এ আছে "The Sun indeed is the honey as in Modhuvidya" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩/১/১)। সূর্য জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানের অপর পরিভাষা— চৈতন্য। তাই মধু দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি। এই মধুবিদ্যা প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন— "সাধ্যগণের সহিত এক হইয়া প্রণবকে অগ্রণী করিয়া এই মধুবিদ্যা লাভ করিয়া তৃপ্ত হন। সংস্কৃত 'মুখেন' কথার অর্থ করেছেন 'প্রণব' আর এক হইয়া কথার অর্থ করেছেন "চিন্তায় এক হইয়া"। আসলে 'এক হইয়া' মানে আত্মিক একত্ব লাভ করিয়া — One and Oneness যা মধুবিদ্যালাভকারী মানুষটিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। আর মুখেন মানে সর্বক্ষণ অনুশীলনের দ্বারা। কারণ মুখে প্রণব ধ্বনি (নাদ) উচ্চারণ করা যায় না। নাদ হল অনাহত ধ্বনি— আত্মা যে ধ্বনিরূপে প্রকাশ পায়। মুখে শুধু স্মৃতি থেকে ঈশ্বরীয় অনুভূতির কথা বলা যায়, তার প্রতীকার্থ মনন করা যায়। তাই-ই অনুশীলন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বপ্নে ঐ যে অনেকক্ষণ ধরে হাত দিয়ে মধু মুছতে লাগলেন, তার অর্থ এই অনুশীলন। আর বিছানার চাদর জগতের প্রতীক— দেখালো অনুশীলনের দ্বারা তাঁর চৈতন্যে জগৎ আপ্লুত হবে।

ছান্দোগ্যের শঙ্কর ভাষ্যের আনন্দগিরির টীকায় বলছে— প্রথমে দৌ বা দ্যুলোক— তার নীচে অন্তরীক্ষ— অন্তরীক্ষ যেন মধুচক্র— অপূপঃ— তার নীচে সূর্যকিরণসমূহ— মধু।

দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়— দ্যুলোক অর্থাৎ তুরীয়-নির্গুণ ব্রহ্ম। তার নিচে অন্তরীক্ষ— মধুপিষ্ট। সাধক তখন অন্তরীক্ষ—শূন্য। তার আমি নেই। অর্থাৎ তার 'ক্ষুদ্র আমি' নেই। ক্ষুদ্র আমি লোপ পেয়ে 'বিশ্বব্যাপী আমি'তে (Universal Self) পরিবর্তিত হয়েছে। অন্তরীক্ষে সূর্য তারই

বিশ্বব্যাপী প্রাণসূর্যের প্রতীক। সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তারই প্রাণশক্তির সারীভূত রূপ— তাকেই বিভিন্ন উপনিষদে (ঈশ, ছান্দোগ্য ইত্যাদি) পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বলা হয়েছে। বহু মানুষ তাঁকে স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে দেখে। সূর্যের কিরণে যেমন জগৎ প্লাবিত হয় তেমনি তাঁর প্রাণশক্তি জগতকে প্লাবিত করছে। জগৎ কোথায়? তার ভেতরে— "রা"। তাঁর প্রাণসূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ে সেই ভিতরের জগতে। আবার ভিতরের জগৎ ও বাইরের জগৎ এক (identical)। তাই তার প্রাণশক্তির সারীভূত রূপ তাঁর জৈবী দেহের চিন্ময় রূপে বর্হিজগতে অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠে। সকলে তাঁকে দেখে স্বপ্নে, ধ্যানে, এমনকি জাগ্রত অবস্থায় বিচিত্র ভঙ্গীমায়।

ভাগবত প্রণেতা এই অপূর্ব মধুবিদ্যাকে মধুর রসে পরিণত করেছে। তার থেকে বৈষ্ণবরা পরকীয়া রতি সৃষ্টি করলেন— কী জঘন্য কুৎসিৎ রূপ দিল এই মধুবিদ্যাকে— কামজ অভিঘাত— পাশব অভিব্যক্তি। তন্ত্রকার মধুবিদ্যাকে ধারণা করতে না পেরে রেখে দিলে মধুপর্কের বাটিতে খানিকটা মধু করে। সর্বসাধারণকে ঐ মধু দেখে মধুমতী হয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়।

মধুবিদ্যার দ্বারা বিশ্বব্যাপী আত্মিক একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়— ভাগ্যবান আমরা, শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে এই মধুবিদ্যার প্রকাশে জগৎ যে ক্রমেই মধুমতী হয়ে উঠছে বিস্ময়ভরা নয়নে তা প্রত্যক্ষ করছি।

শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গ

মৃত্যু আঘাত হানলে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয় অমৃতের অনুধ্যানে। স্মরণ করে সত্যদ্রষ্টা ঋষিবাক্য 'অসতো মা সদ্-গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়'। এ কী কথা বলছেন ঋষি? মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়— মৃত্যু থেকে নিয়ে চল অমৃতলোকে। কোথায় সেই অমৃতলোক যেখানে মৃত্যু নেই?

বুদ্ধদেবের কাছে এক পুত্রশোকাতুরা জননী* এসে তার পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য বারবার আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। তখন শ্রীবুদ্ধ বললেন, তুমি যদি এক মুঠো সরষে এনে দিতে পার তাহলে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারি। তবে যে বাড়ীতে কেউ কখনও মারা যায়নি সেই বাড়ী থেকে ভিক্ষা চেয়ে আনতে হবে ঐ সরষে। শোকে পাগলিনী জননী দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষে এই অভিজ্ঞতা লাভ করলেন যে মৃত্যু ধ্রুব আর তা সর্বজনীন। মানুষ মাত্রেই মরণশীল। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? তবে কি মৃত্যুকে জয় করার কোন পথ নাই? আবার ঋষিকণ্ঠ গুঞ্জরিত হতে শুনি—

"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানিতস্থূঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসোপরস্তাৎ
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'য়নায়।"

"শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী
আমি জেনেছি তাহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়
তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙিঘতে পার
অন্য পথ নাহি"।।

এই পুরুষকে দেহাভ্যন্তরে সপ্তমভূমি বা সহস্রারে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ

*কিসা-গৌতমী।

রূপে দেখা যায়। তিনি পরমব্রহ্ম, মানুষের স্বরূপ। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে— পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মিন সমূহ তেজো, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যো'সাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি। অর্থাৎ হে প্রজাপতি তনয় সংযমনকর্তা সূর্য তোমার তেজ সংবরণ কর। তোমার কল্যাণতম রূপ দর্শন করব। সবিতা মধ্যবর্তী ঐ পুরুষ ও আমি এক। এই স্বরূপের উপলব্ধিতেই মৃত্যু অপগত হয় ও অমৃত আবির্ভূত হয়।

তাই শ্রাদ্ধের সময় বলা হয় যে তুমি আকাশের সূর্যের দিকে মুখ করে কল্পনা কর যে ঐ সূর্য থেকে মৃত ব্যক্তি তোমার কাছে এল। পিণ্ড গ্রহণ করল। তারপর আবার সূর্যের মধ্যে ফিরে গেল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ পরমব্রহ্ম থেকে সঞ্জাত হয়ে সেখানেই ফিরে গেছে।

কিন্তু পিণ্ডদান কেন? পিণ্ডই বা কী?

পিণ্ড শব্দের অর্থ একত্র পুঞ্জীভূত।* দেহব্যাপ্ত প্রাণশক্তির ঘনীভূত রূপ ভাষান্তরে যাকে বলা হয় কুণ্ডলিনী শক্তি।

গুরু গীতায় বলা হয়েছে মাতা পার্বতীকে দেবাদিদেব শঙ্কর বলছেন—

"গুরু ধ্যানাৎ তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ

পিণ্ডে পদে তথা রূপে মুক্তাস্ত্রে নাত্র সংশয়।।"

এর সরলার্থ ঃ— গুরুর ধ্যান করলে দেহী ব্রহ্ম হয়ে যাবেন এবং পিণ্ডে পদে ও রূপে তার মুক্তি হবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মাতা পার্বতী প্রশ্ন করলেন পিণ্ড কী, পদ কী, রূপই বা কী? শ্রীশঙ্কর উত্তরে বললেন—

পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসম্ উদাহৃতম

রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্।।

অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিই পিণ্ড এবং পদ যেন হংস। বিন্দু হল রূপ

**চাল, কলা, তিল, দুধ, দই, ঘি ইত্যাদি দিয়ে যে পিণ্ড তৈরী হয় তার প্রতীকার্থ হল— ঊর্দ্ধ্বরেত (ঘি) হয়ে মনের (দুধ) শান্ত অবস্থায় (দই) অন্নময় কোষ এই স্থুলদেহ (চাল) হতে নিঃসৃত শাশ্বত সত্তার পরিচায়ক (তিল) আত্মিক শক্তি (কলা) মূলাধারে যখন অবস্থান করে তাকেই পিণ্ড বলে।*

আর রূপাতীত হলেন নিরঞ্জন। একত্রীকরণার্থক পিণ্ড্ ধাতু নিষ্পন্ন পিণ্ডম্ শব্দের অর্থ শক্তি, যে শক্তি নিজেকে বহুধা বিভক্ত করে এক থেকে বহু বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি করে। পিণ্ড মানে এখানে কুণ্ডলিনী শক্তি— সারাদেহে পরিব্যাপ্ত প্রাণশক্তির ঘনীভূত রূপ। পদের উদাহরণ হল হংস। পদ হল গতি সূচক শব্দ। কুণ্ডলিনীর গতি হংসের ন্যায়। যে হনন করতে করতে এগিয়ে যায় সে হংস (হন্তুম গচ্ছতি যঃ স হংস)। কী হনন করে? না, জীবত্ব হনন করে। কুণ্ডলিনী শক্তি যতই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে সহস্রার অভিমুখে যায় ততই জীবত্ব নাশ হয়ে দেবত্ব জাগতে থাকে।

রূপ হল বিন্দু। বিন্দু মানে অতিসূক্ষ্ম অংশ। ষষ্ঠভূমিতে ঈশ্বরীয় রূপ যা দেখা যায় তা ষোল আনা বা পূর্ণ ভগবান দর্শন নয় কেবল ব্রহ্মসমুদ্রের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, সিন্ধুর বিন্দু। তাই ষষ্ঠভূমিতে জ্যোতির্বিন্দুও দেখা যায় যা পরে জগৎব্যাপ্ত হয়।

'রূপাতীতং নিরঞ্জনম্'— সপ্তমভূমিতে পরমজ্যোতির সমুদ্র রূপে নিরাকার আত্মাসাক্ষাৎকার ও পরে নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হলে 'দেহী' ব্রহ্ম হয়ে যায়। একেই বলছে— 'দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ'।

পদ্ম পুরাণে গোকর্ণ উপাখ্যানেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। গোকর্ণ তার দুষ্টবুদ্ধি ভাইয়ের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও পিণ্ডদান করলেও স্বপ্নে জানতে পারলেন তার ভাইয়ের আত্মা শান্তি লাভ করেনি। তখন ঋষিদের পরামর্শে গোকর্ণ সাতটি গাঁটওয়ালা একটি বাঁশ পুঁতে সেখানে সাতদিন ধরে ভাগবত পাঠ করলেন। প্রতিদিন পাঠ শেষে বাঁশটির একটি করে গাঁট ফেটে যেতে লাগল। সাতদিন পর বাঁশটির সাতটি গাঁটই ফেটে গেল ও মৃত আত্মার শান্তি হল। এটি আসলে রূপক। বাঁশ হল সুষুম্নার প্রতীক। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— কোন বাঁশের ফুটো বেশি যেমন ঈশ্বরকটি জীবের। রূপকটির অর্থ হল ঈশ্বরের নাম গুণগান শ্রবণে আপনা হতে সপ্তভূমির এই দেহে সাতটি ভূমির সাধন শেষে সহস্রারে আত্মাসাক্ষাৎকার ঘটে ও এই জীবন্মুক্ত পুরুষের বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষরাও মুক্তি পায়। কেননা তাদের জন্মের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়। কী সেই উদ্দেশ্য? মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হল ভগবান দর্শন ভগবান লাভ— বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মা-বাবার জীবনের

অপূর্ণতা পূর্ণতায় ভরে ওঠে যখন সন্তানদের কেউ পূর্ণতা তথা ঈশ্বরত্ব লাভ করে। তাই বলা হয় সৎ পুত্র পিতাকে মুক্তি প্রদান করে।

শ্রাদ্ধ সম্পর্কে প্রচলিত মত হল, যে ব্যক্তি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হন তাকে পিণ্ড প্রদান করলে তিনি মুক্ত হন। এবং কিছু লোককে খাওয়ালে তারা মৃত ব্যক্তির পাপ গ্রহণ করে তাকে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গারোহণে সাহায্য করেন। অন্যথায় তাকে নরকগামী হতে হবে।

হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি হল বেদ। বেদে নরক শব্দটি নেই। স্বর্গ বোঝাতে বেদে একটা অবস্থা বোঝানো হয়েছে, কোন স্থানকে নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "The Vedanta recognises no sin, it only recognises error. And the greatest error, says Vedanta, is to say that you are a sinner." বেদ বলছেন— মানুষ হল অমৃতের পুত্র। মৃত্যুর পর তার কী গতি হয় সে প্রসঙ্গে বেদ বলছেন— যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করে তাহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিও। তিনিই ব্রহ্ম। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও বলেছেন— "তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে সমাঅত সাগর লহরী সমানা"। সাগরের ঢেউ যেমন সাগর থেকে উত্থিত হয়ে সাগরেই বিলীন হয়, তেমনি মানুষ ব্রহ্মসমুদ্র থেকে সৃষ্টি হয়ে মৃত্যুর পর তাতেই বিলীন হয়। ব্রহ্মলীন হয়। মাঝে ভূত প্রেত হয়ে কিছুকাল কাটায় না। তাই মৃত ব্যক্তির নাম লেখা ও বলার সময় প্রচলিত রীতি হল ঈশ্বর (৺) অমুক লেখা ও বলা। কারও ছবিতে মালা পরিয়ে বোঝানো হয় ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তিনিও পূজ্য হয়েছেন।

শ্রাদ্ধের আচারের মাধ্যমে মৃত্যুর পর মুক্তির চিন্তা বেদসম্মত নয়। কেননা বেদ জীবন্মুক্তির কথা বলেছেন— 'ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহা বেদীন্মহতী বিনষ্টি''। এ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হল তো হল নতুবা চিরতরেই বিনাশ। জীবন্মুক্তি লাভের ধারাটিরও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। ব্রহ্মপুর থেকে অজানা মানুষরূপে সচ্চিদানন্দগুরু দেহের ভিতর আবির্ভূত হয়ে দেহীর মনকে ধাপে ধাপে উপরে তুলে নিয়ে যাবেন। সপ্তভূমির সাধন শেষে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়ে দেবেন। দেহীর উপলব্ধি হবে যে "আমি দেহ নই, আমি আত্মা"।

দেহ আত্মা পৃথকের অনুভূতি যার হয় তিনি সন্ন্যাসী। তাই সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাক্কালে নিজের পিণ্ড নিজে দান করার বিধি আছে। অর্থাৎ যার কুণ্ডলিনী শক্তি আত্মায় পরিবর্তিত হয়ে দেখা দিয়েছে তিনিই সন্ন্যাসী। এটি জীবদ্দশায় দর্শন ও উপলব্ধির বস্তু, পালনীয় কোন আচার নয়।

হিন্দুরা সুখ দুঃখের সকল অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ঋষিদের উপদেশ নিতে যেত। তাদের উপদেশের প্রতীকায়িত (Symbolized) রূপটিকে স্থূলে কিছু আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। তার সাথে মিশেছে অনার্যদের হাস্যকর উদ্ভট কল্পনাসঞ্জাত ক্রিয়াকলাপ।

বিচিত্র আচারের বিধান দিয়ে পুরোহিত কিরকম নিজেদের ফাঁদে নিজেরা জড়িয়ে পড়েছেন তার একটি ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক্।

দুই ছেলে রেখে মা গত হলেন। ছোটটি উকিল। পুরুত ভয় দেখিয়ে গেল মাকে উদ্ধার না করলে যমের দ্বারে আটকে থাকবে। মাতৃদায় বলে কথা। ছেলেরা আর দেরী না করে পুরুতকে সব ব্যবস্থা করতে বলল। পুরুত তো লম্বা ফর্দ করে ফেললে। দুটো গরু চাই। অনেক টাকার ব্যাপার। শেষে সাব্যস্ত হল যে একটার মূল্য ধরে দিলেই চলবে। তারপর দিনক্ষণ দেখে যথারীতি সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে লাগল। মা এবার বৈতরণী পার হবেন। বড় ছেলের হাতে গরুর লেজটা ধরিয়ে দিয়ে পুরুত বললে, ভাবো মা বৈতরণী পার হচ্ছেন। ওই ওপারে গিয়ে উঠলেন। ব্যাস, এবার ছোট ছেলের পালা। সে মূল্য ধরে দেবে। কিন্তু টাকা আর বের করে না। কেবলই মাথা চুলকাতে থাকে। শেষে বললে, ঠাকুর মশাই মাকে দাদা এইমাত্র ওপারে রেখে এল, তা মা আবার এপারে এলো কী করে?

শ্রাদ্ধ যে বৈদিক নয় সে কথা অনেক মণীষীই বলেছেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, সুকুমার সেন, নীহার রায়, বিনয় ঘোষ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ সকলে জানিয়েছেন হিন্দুধর্মে যে শ্রাদ্ধ পদ্ধতি চালু আছে তা বৈদিক নয় মূলত অনার্য কৃষ্টি সম্ভূত, মাতৃকুলাগত। তাই উক্ত আচারে মাতুলালয়ের ভূমিকা থাকে বেশি। মামার বাড়ির লোকেরা কাপড়চোপর এনে ঘাটে ওঠায়। রামায়ণেও আছে রামের আগে সীতা দশরথকে পিণ্ডদান করেছিলেন। এর প্রতীকার্থ হ'ল পিণ্ডদান প্রথা প্রথমে অনার্যদের মধ্যে চালু ছিল। পরে তাদের

কাছ থেকেই আর্যদের মধ্যে এই প্রথা আসে। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মেশানো আছে। বালি বাদ দিয়ে চিনিটুকু নেবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথায় বালি বলতে শাস্ত্রের অসার অংশকে বোঝানো হয়েছে। পিণ্ডদান প্রথাকে শাস্ত্রের অসার অংশ বোঝাতেই বলা হ'ল সীতা বালি দিয়ে পিণ্ডদান করেছিলেন। অশৌচ শূদ্রদের বেশী এবং ব্রাহ্মণদের যে কম দিনের তার মধ্যেও হয়ত এইটেই কারণ যে এই জিনিসটা শূদ্রদের মধ্যে বেশি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রাদ্ধের বিশেষ স্থান হল তীর্থগুলি। গয়াতীর্থ গয়াসুরের নামের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। শাস্ত্র মতে, যেদিন শ্রাদ্ধ করা হয় সেদিন বৈদিক সন্ধ্যা করতে নেই। এমনকি বাম দিকের পরিবর্তে ডান কাঁধে পৈতে পরে সেদিন সন্ধ্যাহ্নিক করার নিয়ম। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাওয়াটা প্রশস্ত নয়। শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেই অগ্রদানীরা অচল। তারা শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করে শুদ্ধ করে দিলে অন্যেরা দান গ্রহণ করতে পারে।

বরাহ পুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তি প্রকরণ থেকে জানা যায় পুত্রশোকে দ্বিজোত্তম নিমি কাতর হয়ে সঙ্কল্প করলেন, 'যা কিছু খেতে সন্তান ভালোবাসত সব সংগ্রহ করে সাতজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াব এবং কুশের উপর পিণ্ড ও জলদান করব, যাতে আমার সন্তানের পরকালে মঙ্গল হয়।' এরূপ কাজ করার পর শোকাবেগ কিছু কমলে প্রবল চিন্তা উপস্থিত হয়, একি করলাম, এরূপ কাজ কেউ তো করেনি। এ অধর্ম কাজের জন্য মহর্ষিরা যদি অভিশাপ দেন তবে কী উপায় হবে। অনন্তর নারদকে দেখে বললেন, 'দেবর্ষে। আমি বলবুদ্ধি স্মৃতিহীন হয়ে নিতান্ত স্নেহবশে যে কাজ করেছি তা অকীর্ত্তিকর, আর্যজনোচিত নয়।' নারদ সমস্ত শুনে স্বর্গীয় পিতাকে স্মরণ করে তার মতামত জানতে উপদেশ দেন। ধ্যান করা মাত্র পিতা উপস্থিত হয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্কল্পিত এই পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধকে প্রজাপতি ব্রহ্মা একটি ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন। পূর্বে যে সকল যজ্ঞের কথা শুনেছ অর্থাৎ শাস্ত্রে চিহ্নিত হয়েছে তন্মধ্যে শ্রাদ্ধকেও ব্রহ্মা একটি অতিরিক্ত যজ্ঞ বা ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এখন শ্রাদ্ধে পিণ্ড দান প্রথা চলছে। বেদের মন্ত্রভাগে এর কোন প্রমাণ নেই। এমন কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই যাতে নিশ্চিত রূপে বোঝা যায়, কুশের উপর পিণ্ড দান করতে হবে। বরাহপুরাণের উক্ত বর্ণনায় সহজেই

বোঝা যায় যে আর্যদের মধ্যে শ্রাদ্ধ প্রচলিত ছিল না, এটি পরবর্তীকালের সংযোজন। ‘‘ঋষি শ্রাদ্ধ’’ কথার অর্থই হ’ল— ক্রিয়াকর্মহীন অনাড়ম্বর ঈশ্বরীয় স্মরণ অনুষ্ঠান।

স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়েছেন শ্রাদ্ধের কথা একমাত্র অথর্ব বেদে আছে। তাহলে যজুর্বেদীয়, সামবেদীয় শ্রাদ্ধ এলো কোথা থেকে?

কিছু পণ্ডিত শ্রাদ্ধকে বৈদিক প্রথা বলে চালাবার উদ্দেশ্যে যজুর্বেদ থেকে কিছু মন্ত্র যোগ করে বলল যজুর্বেদীয় শ্রাদ্ধ পদ্ধতি— অনুরূপভাবে কেউ তৈরী করল সাম-বেদীয় শ্রাদ্ধ পদ্ধতি।

স্মৃতি শাস্ত্র বিশারদ রঘুনন্দন বৈদিক শ্লোককে বিকৃত করে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন; এরূপ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ধাপ্পাবাজিতে একদিন সৃষ্টি হয়েছিল সতীদাহ প্রথা। আজও সগৌরবে চলছে হিন্দুর শ্রাদ্ধ প্রথা— তথা প্রেত পূজা— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানে।

একবারও পুরোহিতরা ভেবে দেখেন না মধু দান প্রসঙ্গে যখন তারা যজুর্বেদ থেকে মধুবিদ্যার শ্লোক ঢোকাচ্ছেন, বলছেন ‘মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধব, ...’ ইত্যাদি তখন মানুষের ব্রম্মস্বরূপত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন। তারপরেই ‘‘অমুক দেবশর্মন প্রেতঃ’’ বলে আর মন্ত্র পড়া যায় না। ঋত মানে সত্য। ঋতায়তে মানে সত্যাশ্রিত ব্যক্তির জন্য মধুবাতা অর্থাৎ বায়ু সমূহ মধুক্ষরণ করে ..... ইত্যাদি। এখানে ঋষির প্রার্থনা, তার প্রাণচৈতন্য (প্রতীকে মধু) পিতৃপুরুষ, উৎসপুরুষ গ্রহণ করুক তথা অখন্ড চৈতন্যে লীন হোক। ব্রম্ম অনুভবে তার ব্রম্মবিদের দৃষ্টিলাভ হোক। সর্বত্র আনন্দং ব্রম্মের প্রকাশে মধুমতী জগতকে যেন তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

প্রিয়জনের মৃত্যুতে মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে মন নিম্নভূমিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলে আত্মিক ও মানসিক অবস্থার অবনমন হয়। দেহের পবিত্রতা (divinity) কমে যায়। তাই বলা হয় মৃত্যু-অশৌচ হয়েছে। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ন যখন শোকগ্রস্ত ছিলেন তখন তাকে ‘‘শূদ্র’’ বলে সম্বোধন করেছেন ব্রম্মবিদ রৈক্ক।

এই আত্মিক অবকর্ষতা থেকে মুক্তির উপায় পবিত্রতম ঈশ্বরের অনুধ্যান,

বিশেষতঃ সম্মিলিত ভাবে তার মাহাত্ম্য অনুশীলন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— বেদে নরকের কথা নেই। পৌরাণিক যুগে নরকের ভাবনা এসেছে। বেদে যম বলতে সংযমনকর্তা সূর্যের তথা প্রতীকে বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণসূর্যের কথা বলা হয়েছে।

এদিকে শ্রাদ্ধকাররা কাকবলি দিয়ে অর্থাৎ কাকের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদন করে মন্ত্র পড়ছেন, হে মহাত্মন বায়স, আপনি যমলোকে গিয়ে ধর্মরাজকে খবর দিন এবং অমুক গোত্রের অমুক প্রেত যমলোক গেলে তার যাতে যথাবিহিত আপ্যায়ণ হয়, তার ব্যবস্থা করুন। কী উদ্ভট কল্পনা। শ্রাদ্ধকাররা মহাত্মা খুঁজে পেয়েছেন মানুষ ছেড়ে বায়স কুলের মধ্যে।

সম্ভবত ভাবনাটি এসেছে কাকভূষণ্ডীর রূপক থেকে। যেখানে বলা হয়েছে কাকভূষণ্ডী একজন যথার্থ জ্ঞানী ঋষি যিনি বুঝেছিলেন রামচন্দ্র মানুষ হলেও পূর্ণব্রহ্ম। তাই কাকরূপ ধারণ করে রামের উচ্ছিষ্ট খেয়েছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত মানুষের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতবাণীর রসাস্বাদন ও হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছিলেন আপন অন্তরে আত্মাপাখী বিকাশ লাভ করায়।

যমলোকগত প্রেতের উদ্দেশ্যে খাবার ও জলদানের প্রসঙ্গে নানকের একটি কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। একবার পাঞ্জাবে রাভি নদীর ধারে ব্রাহ্মণদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে দেখে নানক নদীতে নেমে পাড়ের দিকে জল ছেটাতে লাগলেন। তার এরূপ আচরণের কারণ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন আমি এইভাবে আমার জমিতে সেচ দিচ্ছি। তারা বললে, সে কী, তোমার ক্ষেত তো বহু দূরে। নানক বললেন, বা রে! তোমাদের পিতৃপুরুষ কোন দেবলোকে আছে— এখান থেকে জল দিলে যদি তারা পায় তাহলে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে আমার বাড়ী সংলগ্ন জমিতে এই জল যাবে না কেন?

এ প্রসঙ্গে কবীরের জীবনেও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার গুরু রামানন্দ তার পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য দুধ সংগ্রহের দায়িত্ব দেন প্রিয় শিষ্য কবীরকে। উনি অনেক খুঁজে একটি মৃত গাভীর কাছে এসে দুধের পাত্রটি যথাস্থানে রেখে গাভীর মুখের কাছে ঘাস তুলে খেতে দিলেন। যেন গাভী একদিকে ঘাস খাবে আর অন্যদিকে দুধ ঝরবে। কিন্তু মৃত গাভী ঘাসও খেল না, দুধও দিল না। এদিকে তো দিন চলে গেল। কবীর দুধ নিয়ে

ফিরলেন না দেখে রামানন্দজী আর একজন শিষ্যকে পাঠালেন কবীরের খোঁজে। কবীরকে পাওয়া গেল। তার কীর্তিকাহিনী শুনে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে পাঠালাম দুধ আনতে আর তুমি গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে একটা মরা গরুর কাছে? এর কারণ কী? কবীর উত্তরে বলল, আমি ভেবেছি যে মৃত পিতার জন্য মৃত গাভীর দুধই উপযোগী হবে। কিন্তু দুধ দেওয়া তো দূরের কথা গাভীটা ঘাসই খেল না। গুরু রেগে বললেন, মরা গরু কখনও ঘাস খেতে পারে? কবীর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, সদ্যমৃত গরু যদি ঘাস খেতে না পারে তো বহুবর্ষপূর্বে যার মৃত্যু হয়েছে তিনিই বা দুধ পান করবেন কেমন করে? আপনিই বা কেন তার উদ্দেশ্যে দুধ নিবেদন করছেন? গুরু কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না।

ইদানীং অনেকে ধুমধাম করে হনুমানেরও শ্রাদ্ধ করছেন বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে। বৈদিক কৃষ্টির অবমূল্যায়ণ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়।

ঋষি বললেন, মৃত্যু আঘাত হেনেছে, অমৃত পুরুষ, শাশ্বত পুরুষ, ধ্রুব পুরুষকে আঁকড়ে ধর। তাহলে মৃত্যুময় সংসার রূপ লঙ্কাপুরীর মধ্যেও রামময় জীবিতা সীতার ন্যায় খুঁজে পাবে অশোক কানন। প্রতীকে বাইরে তাকেই আচার করা হল— শবদাহ করে ফিরে আসার সময় স্থির জীবনের প্রতীক একটি গাছকে কোল দিতে হবে। আঁকড়ে ধরতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা। এরই নাম মুক্তি। পরব্রহ্মই নিজের স্বরূপ। আমি আর পরব্রহ্ম এক। মায়ার দরুন জানতে দেয় না। হরিশকে বললুম, আর কিছু নয় সোনার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে, সেই মাটি ফেলে দেওয়া। দেহজ্ঞান বিবর্জিত অবস্থায় নিজের স্বরূপ উপলব্ধির প্রতীক হিসাবে শবদাহ করার আগে শবের উপর সপ্তখণ্ড স্বর্ণ দেবার প্রথা চালু হল। জীবিত অবস্থায় সপ্তভূমির সাধন হয়ে সোনা অর্থাৎ আত্মার মুক্তির প্রার্থনা ভুলে তাকে ভ্রান্ত আচারে পর্যবসিত করা হল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাঞ্জাবে আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রাদ্ধের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন তার ‘‘সত্যার্থ প্রকাশ’’ বইতে। আর্যসমাজীরা শ্রাদ্ধ করেন না।

প্রায়শই পুরোহিতরা গর্ব করেন এই বলে যে আমাদের ধর্ম কত উদার দ্যাখো। পিণ্ড দানের সময় প্রথম আমরা পিণ্ড দিই যার কোন কুলে কেউ নেই তাদের। খুব ভালো কথা। যদি কেউ সত্যিই বিশ্বাস করে যে তার পিণ্ডদানে সব মৃত ব্যক্তি উদ্ধার হয়ে যাবে তাহলে তো দ্বিতীয় কারও শ্রাদ্ধ করার কোন প্রয়োজন থাকে না। যদি বলেন তাৎক্ষণিক মুক্তির জন্য, তাহলে প্রশ্ন উঠবে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা আদ্যশ্রাদ্ধের যৌক্তিকতা কী? আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধে যোড়শ পিণ্ডদান পদ্ধতিতে বলা হচ্ছে— পশুযোনিগতা পক্ষী-কীট-সরীসৃপ এবং বৃক্ষযোনিপ্রাপ্ত সকল মৃত আত্মাকে পিণ্ড দান করছি। কী ভয়ঙ্কর কথা। মৃত মানুষটি যে কোন কীট পতঙ্গ, গাছপালা হতে পারে! তাহলে তো কোন রকম কীট পতঙ্গাকে হত্যা করা, এমনকি গাছপালাও কাটা চলবে না। এই মতে আন্তরিক বিশ্বাসী কেউ আছেন কি যে কোন প্রাণী ও বৃক্ষাদিকেও আঘাত করেন না কখনও? এ কী সম্ভব?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ব্রাহ্মধর্মেও শ্রাদ্ধ বাসরে অনুরূপ বাণী উচ্চারণ করা হয়। পরলোকগত ব্যক্তি যেন স্বর্গে যান ইত্যাদি প্রার্থনা জানানো ও তর্পণাদি করা হয়। যদিও পিণ্ডদান প্রথা নেই। তাই ব্রাহ্মধর্মের শ্রাদ্ধবাসরীয় প্রার্থনাও সমদোষে দুষ্ট। ব্রাহ্মরাও সকল মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ও পক্ষীকীট সরীসৃপ বৃক্ষ সমূহের উদ্ধার কল্পে তর্পণ করে মন্ত্রপাঠ করে বলেন, ‘ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তন্তু ভুবনত্রয়’। আমার দেওয়া এই জলে ত্রিভুবন তৃপ্ত হোক।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বেলায় (মৃত্যুর ছ’মাস আগে রোগশয্যায়) তার উপলব্ধির কথা জানালেন—

“আমার আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি, ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ
এক চির মানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত!”

অর্থাৎ আমি নেই, আছে সেই ‘এক মানব’ যিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন।

তাঁকে উদ্ধার করার প্রশ্ন নেই আর করবেই বা কে? দ্বিতীয় কেউ নেই। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।

একদা প্রিয়জনের (পিতার) মৃত্যুঘটনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে দীক্ষার প্রথম উদ্‌বোধন জাগে। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার মর্মবাণী হিসাবে ৭ই পৌষের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বারবার তুলে ধরেছেন উপনিষদের একটি মন্ত্র 'ঈশাবাস্যং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' সমস্ত জগৎ ঈশ্বর দ্বারা আবৃত। বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পাওয়াই অমৃতলোককে উপলব্ধি করা। আর তার প্রথম ধাপ নিজের মধ্যে ভূমার আশ্রয় লাভ তথা দেবতার সাথে একাত্মতা উপলব্ধি।

রবীন্দ্র চেতনায় অবগাহন করলে তর্পণাদির মাধ্যমে আত্মার মুক্তির আয়োজন যে কত হাস্যকর তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইসলাম, খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মে জন্মান্তরবাদ নেই তাই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থাও নেই। বেদান্ত মতেও পুনর্জন্ম নাই। ৮৪ লক্ষ জন্ম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিহাস ও প্রতারণা।

না, সমালোচনা নয়। পিণ্ডদানের প্রকৃত অর্থটি শুধু জানলেই আমরা বুঝতে পারব যে বাইরে পিণ্ডদান প্রথার প্রচলিত আচরণটি সত্যবর্জিত। তবে শাস্ত্রে নানা বিরুদ্ধমতের সহাবস্থান ঘটেছে। নানা মুনির নানা মত। তাহলে পথ কী?

ঋষি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, 'মহাজন যেন গতাঃ স পন্থা'। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত পিতার পিণ্ডদান করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন চৈতন্য মহাপ্রভু হলেন তখন প্রিয় শিষ্য হরিদাসের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধের আয়োজন না করে মহোৎসব করলেন। তাঁর অনুগামী বৈষ্ণবসমাজ এই নতুন ধারাই অনুসরণ করল।

সত্যমূর্তি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি— তিনি গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখলেন হাত গলে সমস্ত জল পড়ে যাচ্ছে, কিছুতেই তর্পণ করতে পারলেন না। তখন কাঁদতে লাগলেন।

হলধারী দাদা বললেন, কাঁদিস না। ভারতে (মহাভারতে) এর উল্লেখ আছে। একে বলে গলিত হস্ত। যার দেহে সত্য প্রতিষ্ঠা পায় সে মিথ্যাচার করতে পারে না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেহ দিয়ে বুঝলেন, শ্রাদ্ধ মিথ্যা।

এর অনুকূলে শাস্ত্রীয় সমর্থনও পেলেন। তিনি বললেন, ‘‘শ্রাদ্ধান্ন খেও না। কারও কারও শ্রাদ্ধ শেষে ইষ্টের পূজা হয়ে দাঁড়ায়। দ্যাখো না বৈষ্ণবদের শ্রাদ্ধ নাই, তারা মহোৎসব করে’’। বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য গল্প বললেন, একজন কসাই একটা গরু নিয়ে যাচ্ছিল। পথে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে লক্ষ্য করল একটা বাড়ীতে শ্রাদ্ধের খাওয়া দাওয়া চলছে। সে গরুটিকে কাছেই একটি গাছে বেঁধে ঐ শ্রাদ্ধ বাড়ীতে দুটি খেয়ে এসে গায়ে বল হলে আবার গরুটিকে নিয়ে গেল। সে যখন গরু কাটলে তখন ঐ গোহত্যার পাপ হল যিনি শ্রাদ্ধ করেছেন তার। অর্থাৎ শ্রাদ্ধকর্ম করে পূণ্য অর্জন তো করা যায়ই না বরং পাপের ভাগী হতে হয়। আর যত বেশি মানুষকে এতে যুক্ত করা হবে পাপ ততই বৃদ্ধি পাবে।

এবিষয়ে তার ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ পেয়েছে অপর একটি গল্পে। তিনি বললেন, এক ছাগলের পালে একদিন এক বাঘিনী এসে পড়ল। শিকার ধরতে যেই বাঘিনীটা লাফ দিয়েছে অমনি প্রসব হয়ে গেল। বাঘিনীটা মারা গেল। বাঘবাচ্চাটা ছাগলের পালে বড় হতে লাগল। ছাগলের মত সেও ঘাস খায়, ম্যা ম্যা করে। বহুদিন বাদে একটা নতুন বাঘ সেখানে এল। ছাগলের পালে বাঘবাচ্চা দেখে সে অবাক। সে তখন ঐ বাচ্চাটাকে ধরে টানতে টানতে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে ছায়ামূর্তি দেখিয়ে বলল, ঐ দ্যাখ আমার যেমন হাঁড়ির মত মুখ তোরও তেমনি হাঁড়ির মত মুখ। তারপর একটুকরো মাংস খাইয়ে দিতেই সে হালুম করে উঠল। ছাগল অনার্যকৃষ্টির এবং বাঘ আর্যকৃষ্টির প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে মাংস অর্থাৎ শারীরবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অনুভূতি দান করে রক্তে থাকা বৈদিক কৃষ্টিকে জাগিয়ে তুলছেন, যে কৃষ্টি মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে, যেখানে ভূত প্রেতের ঠাঁই নেই।

পরিশেষে স্মরণ করি রামকৃষ্ণ চেতনা ধারায় স্নাত ও পরে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল মহামানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের বজ্র নির্ঘোষ আহ্বান— ‘হাজার হাজার বছর ধরে শ্রাদ্ধ তথা প্রেতের পুজো করিয়ে জগতের দরবারে ভারতবাসীকে প্রেত করে রেখেছে। জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর পরও চলেছে সগৌরবে তার নিজেরই শ্রাদ্ধ। ভারতবাসী যেন জগতে এসেছে তার একটি মাত্র কাজ নিয়ে শ্রাদ্ধ— যা সর্বৈব মিথ্যা। শুধু ধাপ্পা। মানুষ হও। মিথ্যাকে উচ্ছেদ কর।’

যুক্তি তর্কের অবতারণা করে সত্যকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। তাই ঋষি বললেন, ঋতম্ বদিষ্যামি, সত্যম বদিষ্যামি। তোমার অনুভূতির কথা বলবে তবেই সত্য বলা হবে। অন্তরে দর্শন সাপেক্ষে শ্রাদ্ধ যে মিথ্যা তা অনেকেই শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপায় উপলব্ধি করেছেন ও করছেন— ঘোষণা করছেন শ্রাদ্ধ মিথ্যা!!

তথ্যসূত্র ঃ

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত— শ্রীম কথিত।
২। ধর্ম ও অনুভূতি — কুড়িয়ে পাওয়া মানিক।
৩। ভারতের সংস্কৃতি— ক্ষিতিমোহন সেন।
৪। গুরু গীতা— উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত— স্বামী রঘুবরানন্দ সংকলিত।
৫। পুরোহিত দর্পন— সৌরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য।
৬। অনুষ্ঠান পদ্ধতি ঃ আশ্রম গুরু রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসর— শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত।
৭। সত্যার্থ প্রকাশ— দয়ানন্দ সরস্বতী— বৈদিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট।
৮। কবীর— পারসনাথ তিওয়ারী— অনুবাদক— শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায় ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী।